আসহাবুল কুরআন

নাসীম আরাফাত

কুরআনের অমর কাহিনীগুচ্ছ

আস্‌হাবুল কুরআন

নাসীম আরাফাত
উস্তাদ. জামিয়া শরইয়্যা
মালিবাগ, ঢাকা-১২১৯

মাকতাবাতুল আখতার
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১৮৫২৭১০২

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১০ ঈ.

কুরআনের অমর কাহিনীগুচ্ছ- আসহাবুল কুরআন

□ প্রকাশক : হাফেয মাওলানা আহমদ আলী

মাকতাবাতুল আখতার

□ স্বত্ব : সংরক্ষিত □ প্রচ্ছদ : হা-মীম কেয়ায়েত

□ কম্পোজ : ব ই ঘ র বর্ণসাজ বাংলাবাজার ঢাকা, ০১৭১১৭১১৪০৯

মূল্য : ৯০ টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-8807-08-8

অ র্প ণ

পিতা-মাতার হস্ত মুবারকে
যাঁদের স্নেহের চাঁদোয়া তলে
আজো নিশ্চিন্তে আছি–
দুআর কাঙাল–

– নাসীম আরাফাত
০২/০৯/০৪

আমাদের কথা

অন্ধকারে ছেয়ে গেছে গোটা সমাজ। আলোর সন্ধান পাওয়া এখন দুরূহ ব্যাপার। দারিদ্রপীড়িত অসহায় মানুষেরা যখন দারিদ্র্যের কষাঘাতে অতিষ্ঠ অস্থির, তখন সেবার আবরণে ফেরেশতার বেশ ধরে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌছে গেছে ইবলিস বাহিনী। লাখ লাখ বনি আদমকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে খৃষ্টধর্মের অলীক ধাঁধার দিকে। যে ধাঁধার হাতছানি দেখতে যতোই মনোরম চিত্তাকর্ষী হোক কিন্তু তার অন্তরালে যে গোমরাহী, ভ্রষ্টতা ও জাহান্নামের লেলিহান অগ্নি দাউ দাউ করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোন সংশয় নেই।

এদিকে দেশীয় একদল ভেক সাহিত্যের নামে শিক্ষিত সমাজের ভবিষ্যত প্রজন্মকে নিয়ে যাচ্ছে এক গভীর অমানিশার দিকে। অশ্লীলতা-বেহায়াপনা আর বেলেল্লাপনার দিকে। অথচ সাহিত্য একটি আদর্শ জাতি গঠনের উত্তম হাতিয়ার। শিক্ষিত সমাজে নিরব-বিপ্লবের এক উত্তম অব্যর্থ গণমাধ্যম। অথচ এ হাতিয়ার, এ গণমাধ্যমও চলে গেছে দুশমনদের হাতে।

তাই সমাজে আজ অন্ধকারের লাভা বয়ে চলছে। শয়তানদের দৌরাত্ম্যে আজ মুমিনরা অস্থির। দিশেহারা। মাঝে মাঝে একটু আধটু আলোর ঝলকানি দেখা দিলেও পরক্ষণেই আরো গভীর ঘুরঘুট্টি অন্ধকার নেমে আসে। দুঃসাহসী মন সহসা চমকে উঠে। হতাশাচ্ছন্ন হৃদয় অকস্মাৎ থমকে দাঁড়ায়। ইতিউতি করে এদিক সেদিক তাকায়।

কিন্তু না। সত্যের বৈজয়ন্তী আল্লাহ যাঁদের হাতে তুলে দিয়েছেন তাদের জীবন-অভিধানে হতাশা-নিরাশা-ব্যর্থতা এ ধরনের কোন শব্দ থাকতে পারে না। শত বাধার বিন্ধাচল পেরিয়ে তাঁদের সম্মুখে এগিয়ে যেতেই হবে। তাঁদের যাত্রা হবে দুর্দম। তাঁদের পদবিক্ষেপ হবে দুর্বার। তাঁদের শির হবে চির উন্নত। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে তাঁরা তীর তীব্র গতিতে এগিয়ে যাবে। তাহলেই তাঁরা বিন্দু থেকে সিন্ধু হতে পারবে। দেশ ও জাতিকে হিদায়াতের নির্মল আলো উপহার দিতে পারবো।

এ চিন্তায় শরবিদ্ধ অস্থির হৃদয়ের ফসল, 'কুরআনের অমর কাহিনীগুচ্ছ : আসহাবুল কুরআন'। তাফসীর, ইতিহাস ও কুরআনের কাহিনীমূলক গ্রন্থসমূহ থেকে ঘটনার নির্যাস ধারণ করে গল্পের বর্ণিল আবরণে রসাত্মক, প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় বিভিন্ন জাতি ও নবী রাসূলের বৈচিত্র্য ও দীপ্তময় জীবন-কাহিনী তাতে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

আশা করি, এ কাহিনীগুচ্ছ পাঠ করে আমরা জীবন-পথের দিশা সংগ্রহ করতে পারব। চির সত্য, সুন্দর ও নির্মল পথে দৃঢ় পদে এগিয়ে যেতে পারব। মানুষ মাত্রেই ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তাই কারো দৃষ্টিতে ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা অবহিত করার বিনীত নিবেদন রইল।

বিনীত

নাসীম আরাফাত
৪০৩/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা,
ঢাকা-১২১৯

وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه الحق ومو عظة وذكرى للمؤمنين

"আর আমি রাসূলগণের সকল সংবাদ তোমার নিকট বর্ণনা করছি, যা দ্বারা আমি তোমার হৃদয়কে মজবুত করি। আর এভাবে তোমার নিকট মহা সত্য, ঈমানদারদের জন্য নসীহত ও স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে।" [সূরা হুদ : ১২০]

আস্‌হাবুস সাফীনা*

সে অনে-ক অ-নে-ক দিন আগের কথা। পৃথিবীতে মানব যাত্রার প্রায় শুরু লগ্নের কথা। ইরাকের কুফা নগরীর এক স্থানে বিশাল জনবসতি গড়ে উঠেছিল সে যুগে। প্রচুর গাছপালা আর বাগ-বাগিচায় ভরপুর ছিল জনবসতিটি। চারদিকে প্রাচুর্যের ছোঁয়া। বড় বড় ঘরবাড়ি, মনোরম বাগান ও ফলমূলের কোন অভাব নেই। ছায়াঢাকা, পাখিডাকা এক স্বপ্নীল পরিবেশ। এক অবিশ্বাস্য দুনিয়া।

জনবসতির মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট মন্দির। মন্দির চত্বর পেরিয়ে সামনে অগ্রসর হলেই চোখ ধাঁধিয়ে যায় হাতেগড়া বিশাল বিস্ময়কর মূর্তি দেখে। এ জনবসতির লোকেরা মূর্তিপূজক। নিজ হাতে মূর্তি বানিয়ে এদের প্রণাম করে। মূর্তির সামনে নজর-নিয়ায পেশ করে। বিনয় বিগলিতকণ্ঠে মূর্তির নিকট তাদের দুঃখ-দুর্দশা ও হাজত-প্রয়োজনের কথা বলে সাহায্যের আবেদন করে। তারপর দুরুদুরু হৃদয়ে অশ্রু মুছতে মুছতে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে। এ জনবসতির মানুষদের এটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

* আস্‌হাবুস সফীনা : অর্থ জলযানের আরোহীগণ। হযরত নূহ আ. এর গোত্রের মধ্য হতে যারা মুসলমান হয়ে জলযানে আরোহণ করেছিলেন এবং আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, তাদেরকেই আসহাবুস সাফীনা বলা হয়।

জনবসতির কিছুটা বাইরে, কিছুটা জনহীন এলাকায় এক বৃদ্ধ একটি জলযান তৈরি করছেন। কাঠের পর কাঠ কেটে, পেরেকের পর পেরেক মেরে তিনি জলযানটি তৈরি করছেন। একেবারে তন্ময় হয়ে ও একেবারে আত্মনিবিষ্ট হয়ে তিনি তা তৈরি করছেন।

জনবসতির কিছু লোক এ পথেই কোথাও যাচ্ছিল। তারা বৃদ্ধকে দেখে এগিয়ে এল। ডাগর চোখে বৃদ্ধ যা করছে তা দেখল। তারপর তিরস্কারের বিষ মিশিয়ে বলল, কী হে নূহ! কাঠমিস্ত্রি আবার বনে গেলে কবে থেকে? তোমাকে কত বললাম, ঐ নীচু লোকদের সংশ্রব ছেড়ে দাও। আমাদের কথা কানে তুললে না। এখন দেখছি তাদের সোহবতে থেকে বেশ দক্ষ কাঠমিস্ত্রি হয়ে গেছ। এই কী তোমার বুদ্ধি! এই কী তোমার আক্কেল!!

নূহ আ. এর কণ্ঠে কোন প্রতিবাদ নেই। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তিনি তাদের দিকে চেয়ে থাকেন। হয়তো অনেক কথাই ভাবেন। কিন্তু কিছুই বলেন না। আবার নিজ কাজে আত্মলীন হয়ে যান।

কিন্তু না, শান্তি নেই। স্বস্তি নেই। আবার এগিয়ে এল কিছু লোক। নূহ আ.-এর কাজ দেখে তারাও নিরব থাকতে পারল না। সাথীদের বলতে লাগল, এ স্থলভূমিতে জলযান চলবে কোথায়? এ অনর্থ কাজের কি কোন মানে হয়? আসলে বুড়োটা একেবারে পাগল হয়ে গেছে। কী হে নূহ্! তোমার এই জলযান কি বালির উপর দিয়ে চলবে, না পাহাড়ের উপর দিয়ে চলবে?! না বলদরা তা বালির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে?!

নূহ্ আ. তাদের তিরস্কারের বিষাক্ত বাণে একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠেন। চোখ তুলে তাদের দিকে তাকান। সে চোখে নেই কোন আবিলতা। নেই কোন হিংস্রতা। হৃদ্যতা আর সহমর্মিতায় ভরা সে চোখের চাউনি। তিরতির করে কেঁপে উঠে তাঁর ওষ্ঠাধর। তিনি বলেন, তোমাদের কত বুঝালাম! কিন্তু তোমরা বুঝলে না। আল্লাহর আযাব সমাগত। তবুও তোমরা তিরস্কার ছাড়লে না। দেখবে, একদিন কিন্তু আমরাও তোমাদের তিরস্কার করব যেমন তোমরা আজ আমাদের তিরস্কার করছ।

তারপর আবার নূহ্ আ. জলযান বিনির্মাণে আত্মলীন হয়ে যান। কিন্তু মন তাঁর অস্থির। কেবলই এদিক সেদিক ছুটে যান। তিনি ভাবেন। অতীতের

স্মৃতিচারণ করতে করতে সুদূর অতীতে হারিয়ে যান। আমার যখন পঞ্চাশ বছর বয়স তখন আল্লাহ আমাকে নবুওয়ত দান করলেন। তখন আমার দেহ ছিল কান্তিময়। মাংসপেশীতে ছিল প্রচুর শক্তি। আমি সকাল-সন্ধ্যা আর রাত-দুপুরের চিন্তা করতাম না। প্রবল আগ্রহ ও অসীম আবেগ নিয়ে সম্প্রদায়ের একেক জনের নিকট ছুটে যেতাম। মূর্তিপূজা পরিহার করে আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান জানাতাম। কয়েক জনকে একত্রিত করে বুঝাতাম। একেক জনকে আলাদাভাবে বুঝাতাম। আল্লাহর কুদরত ও শক্তির কথা বলে বেড়াতাম। কিন্তু না। তারা তাদের ঐ মূর্তিগুলোর পূজা ছাড়তে নারাজ। ওয়াদ, সূয়া, ইয়াওছ, ইয়াউক ও নসর নামের মূর্তিগুলোর জন্য তারা পাগল। আমি কতো বুঝালাম, এদের কোন শক্তি নেই। এরা সুখ-শান্তি দিতে পারে না। এরা ধন-সম্পদ দিতে পারে না। এরা হায়াত-মউতের মালিক নয়। কিন্তু তারা আমার কথায় কর্ণপাতও করল না।

আসলে ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসর, এরা ছিলেন তাদের যুগের আল্লাহওয়ালা নেককার ও সৎকর্মপরায়ণ কয়েকজন ব্যক্তি। এঁরা আল্লাহর নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা মঞ্জুর করতেন। মানুষের সকল সমস্যার সমাধান এঁরা দুআর মাধ্যমেই করে দিতেন। তাই যুগের লোকেরা তাদেরকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসত। তাদের নির্দেশ পালনে কোন ভ্রূপেক্ষ করত না। এরপর একের পর এক তাঁরা ইন্তেকাল করলে তাঁদের ভক্তরা তাদের বিরহে ব্যাকুল ও অস্থির অবস্থায় দিন কাটাতে থাকে। কোন কিছুতেই তারা শান্তি পায় না। হৃদয়ে এক উন্মনা উন্মনা ভাব বিরাজ করতে থাকে।

মানুষের চিরশত্রু শয়তান তাদের এ অবস্থাকে কাজে লাগানোর জন্য সাধুর বেশ ধরে তাদের নিকট এল। যেন হৃদয়ে তার এক আকাশ দরদ আর এক সমুদ্র সহমর্মিতা। ইনিয়ে বিনিয়ে বলল, দেখ, এসব বুযুর্গ ব্যক্তিদের মহব্বত ও ভালোবাসাই কিন্তু তোমাদের নাজাতের পথ। কিন্তু তোমরা তো কিছুদিনের মধ্যেই তাদের কথা ভুলে যাবে। তখন তোমাদের অবস্থা কি হবে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ... হ্যাঁ, আপনার কথা ঠিক। কিন্তু কিভাবে আমরা তাদের মহব্বত ও ভালোবাসা ভুলব না? তার কোন পথ থাকলে আমাদের তা বলে দিন।

শয়তান বলল, তোমরা এক কাজ কর। তাদের প্রতিকৃতি তৈরি করে ইবাদতখানায় রেখে দাও। ব্যস..., ইবাদত করতে এলেই তাদের প্রতিকৃতি দেখে তোমাদের হৃদয়ের ভালোবাসা উথলে উঠবে। তাদের স্মৃতি তোমাদের মানসপটে ভেসে উঠবে। ফলে তাদের প্রতি তোমাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। ইবাদতে এক অতিন্দ্রিয় স্বাদ অনুভব করবে।

সরলমতি লোকেরা বলল, বাহ্! ... ভারি চমৎকার কথা। আমরা অবশ্যই তাদের প্রতিকৃতি বানিয়ে ইবাদতখানায় রাখব। শয়তান তার কূটকৌশলে বিজয় লাভ করল। এদিকে লোকেরা বুযুর্গ ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি তৈরি করে ইবাদতখানায় সসম্মানে রাখার ব্যবস্থা করল। তারপর থেকে ইবাদতখানায় গেলেই তারা তাদের প্রতিকৃতিগুলো দেখে। তাদের সম্মান করে। নতশিরে তাদের সামনে দাঁড়ায়। তাদের স্মৃতি জাগরিত করে ইবাদতে বিশেষ পুলক অনুভব করে।

সময়ের বিবর্তনে সে প্রজন্মের লোকেরা মৃত্যুবরণ করল। পূর্বপুরুষরা ইবাদতখানায় গিয়ে এ মূর্তিগুলোর সামনে নতশিরে নিরবে দাঁড়িয়ে থেকেছে। মূর্তিগুলোর সামনে কেঁদে কেঁদে বিড়বিড় করে কি সব বলেছে। তারপর প্রশান্তচিত্তে ইবাদতখানা থেকে বেরিয়ে এসেছে। এর চেয়ে বেশি তারা চিন্তা করেনি। এ নিয়ে তারা মাথাও ঘামায়নি।

কিন্তু আযাযিল শয়তান বসে রইল না। সে তো এমন একটি সময়ের জন্যই দীর্ঘকাল যাবত বসে আছে। সে আবার সাধুর বেশে আবির্ভূত হল। অত্যন্ত দরদমাখা কণ্ঠে বলল, শোন, হে বন্ধুরা আমার! ঐ ইবাদতখানাগুলোতেই তোমাদের প্রকৃত শান্তি নিহিত রয়েছে। তোমাদের পূর্বপুরুষদের কি দেখনি, তারা কিভাবে সকাল-সন্ধ্যা ইবাদতখানাগুলোতে পড়ে থাকতো? ঐ মূর্তিগুলোর পূজা করতো? তাই তো তারা এত সুখে শান্তিতে ছিল। জীবনে তাদের কোন অভাব-অভিযোগ, কোন দুঃখ-কষ্ট ছিল না। সুতরাং শান্তি পেতে হলে তোমরা পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঐ মূর্তিগুলোর পূজা শুরু কর। আর দেরি করো না।

শয়তানের বেশভূষা আর মায়া ভরা কথা শুনে সবাই মাথা দোলাল। বলল, হ্যাঁ, আপনি সত্য বলেছেন। আমরা শৈশবকাল থেকেই আমাদের

পূর্বপুরুষদেরকে তাদের পূজা করতে দেখেছি। আমরা আপনাকে কথা দিলাম, আজ থেকে আমরা এ মূর্তিগুলোর পূজা শুরু করব।

সেদিন থেকেই মানুষ মূর্তিপূজা শুরু করল। আল্লাহর একত্ববাদ ও তাওহীদের কথা ভুলে গেল। শয়তান হাত ধরে তাদের জাহান্নামের পথে নিয়ে চলল।

কিন্তু দয়াময় আল্লাহ চান না, আদম সন্তানরা তাঁর কোপানলে পড়ে চির জাহান্নামী হোক। তাই আমাকে তাদের মাঝে পাঠালেন। আমি তাদের আল্লাহর দিকে ডাকতে লাগলাম। তারা আমার কথা মানল না। ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করল।

তারা বলল, হে নূহ! তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ। আমাদের মত পানাহার কর। হাটে-বাজারে যাও। ঘুমাও আবার জাগ্রত হও। তোমাকে কিভাবে আমরা রাসূল হিসাবে মেনে নিতে পারি?

আমি তাদের কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। বললাম, আমি আল্লাহর পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীল, অকাট্য প্রমাণ ও অনুগ্রহ নিয়ে এসেছি। তোমরা সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করলে তা অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু তোমাদের ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও একগুঁয়েমী তোমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তোমরা অন্ধ হয়ে গেছ। তাই তোমরা আমার সরল কথা মানছ না। নিজেদের হঠকারিতায় অটল ও অবিচল হয়ে আছ।

তাদের অবস্থা দেখে ভড়কে গেলাম না। প্রত্যেক দিনই নব উদ্যমে, নব আশায় উদ্বেলিত হয়ে দাওয়াতী কার্যক্রম চালাতে লাগলাম। আমার চেষ্টা বিরামহীন। আমার মেহনত অবর্ণনীয়। ফলে কিছু লোক আমার কথা বিশ্বাস করল। আমার প্রতি ঈমান আনল। মূর্তিপূজা ছেড়ে আল্লাহর ইবাদত করতে লাগল। এরা সমাজের নিম্নশ্রেণীর কিছু লোক। সংখ্যায় একেবারেই কম।

এরপর সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকদের নিকট দাওয়াত নিয়ে গেলে তারা ভীষণ আপত্তি তুলে বলল, হে নূহ! তুমি আমাদের ঈমানের কথা বল। তোমার অনুসরণের কথা বল। কিন্তু কিভাবে আমরা তোমার অনুসরণ করব? তোমার চারপাশে ঐ যে সমাজের ইতর শ্রেণীর স্থূলবুদ্ধির লোকেরা

ভিড় করে থাকে, এদের সাথে কিন্তু আমাদের উঠাবসা সম্ভব নয়। আমরা কুলীন। আমরা অভিজাত। তোমার নিকট আমাদের আসা-যাওয়া ও বসার পরিবেশ তোমাকেই সৃষ্টি করতে হবে। সুতরাং এদেরকে তাড়িয়ে দাও। তাহলেই আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনার কথা বিবেচনা করতে পারি।

তাদের অহংকার ও দম্ভভরা কথা শুনে বিস্মিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে বললাম, ঈমান আনার নাম ভাঙ্গিয়ে তোমরা পূর্বশর্ত দিয়ে আমার উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাচ্ছ। আসলে এটা ঠিক নয়। এটা ভুল চিন্তা। এরা ধন-সম্পদে দরিদ্র হলেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট এদের অনেক মর্যাদা। অনেক সম্মান। তাই আমি এদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। তাহলে তো আমি নিজেই অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হব।

আমি তাদের বারবার বলেছি, শোন! আমি কিন্তু এই দাওয়াত ও হিদায়াত পৌঁছানোর বিনিময়ে তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ, অর্থ-কড়ি চাই না। তোমাদের নিকট কোন মান-মর্যাদারও প্রত্যাশী নই। আমি আমার এই মেহনত-মুজাহাদার বিনিময় ও সওয়াব আল্লাহর নিকটই চাই। তিনিই আমাকে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন।

উহ্, সে দিনের কথা আমি ভুলব না। আমি সম্প্রদায়ের লোকদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে গেলাম। তাওহীদ ও সত্য ধর্ম গ্রহণে তাদের উৎসাহিত করতে গেলাম। মন আমার আশায় টইটম্বুর। মনে মনে দুআ করতে করতে তাদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম। দু'চারটি কথা বলতে না বলতেই তারা মারমুখী হয়ে উঠল। চারদিক থেকে আমাকে লক্ষ্য করে সজোরে পাথর নিক্ষেপ শুরু করল। উহ্, বৃষ্টির মতো পাথর পড়তে লাগল আমার উপর। আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে গেল আমার সর্বাঙ্গ। তবুও রক্ষে নেই। হঠাৎ মনে হল, আমি যেন গাঢ় অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছি। তারপর আর কিছুই মনে নেই। অনেকক্ষণ অচেতন অবস্থায় সেখানে পড়ে রইলাম। ধীরে ধীরে আমার চেতনা ফিরে এলে আমি আমাকে পাথরের স্তূপের মাঝে অনুভব করলাম।

তারপর সব কিছুই আমার মনে পড়ল। দয়ায় মায়ায় ভরা হৃদয় জুড়ে তখন আবার কান্নার ঝড় বইতে শুরু করল। হায় হায়! আমার এ নির্বোধ জাতির

কী হবে? আয় আল্লাহ! আয় রহমান রহীম! এদের ক্ষমা করে দাও। এরা অন্ধ মূর্খ। এরা নির্বোধ। এরা জানে না। এরা বুঝে না। এদের তুমি মাফ করে দাও।

এভাবে কত দিন যে তারা আমাকে মারল। আমার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাল। কতবার যে আমাকে মেরে মেরে ক্ষত বিক্ষত করে অচেতন অবস্থায় মাটিতে ফেলে চলে গেল, তার কোন হিসাব কিতাব নেই। কিন্তু এত কিছুর পরও আমি তাদের জন্য বদ দুআ করিনি। অকল্যাণ কামনা করিনি।

প্রত্যহ সকালে সূর্য যেমন সজীব প্রাণবন্ত হৃদয় নিয়ে উজ্জ্বল আলোয় পৃথিবীকে আলোকময় করে তুলে, আমিও তেমনি প্রত্যহ সকালে নব উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে হিদায়াতের আলোয় মানুষের হৃদয়গুলোকে আলোকময় করে তুলতে বের হতাম। নতুন আশায় বুক বেঁধে দাওয়াতের কাজে নামতাম। সূর্য পৃথিবীকে সত্যই আলোকময় করত। কিন্তু আমি ঐ আত্মভোলা মানুষগুলোর হৃদয়কে আলোকময় করতে পারতাম না। সন্ধ্যায় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত পা টানতে টানতে নিজ কুটিরে ফিরে আসতাম।

আমি যে আল্লাহর প্রেরিত নবী, আমি যে আল্লাহর রাসূল, এর প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ আমাকে দীর্ঘায়ু দান করেছিলেন। এটা ছিল এক সুস্পষ্ট মুজিযা। নবুওয়ত পাওয়ার পর থেকে দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর আমি তাদের হিদায়াতের পথে, জান্নাতের পথে ডেকেছি। প্রায় পরিবারেরই এমন অবস্থা যে, আমি সে পরিবারের পিতাকে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু ঈমান না এনেই সে মৃত্যুবরণ করেছে। তারপর তার ছেলেকে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছি। সেও ঈমান আনে নি। বেঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। তবুও আমি নিরাশ হই নি। আমি এখন তার নাতিকে ঈমানের দাওয়াত দিচ্ছি। এভাবে একই পরিবারের তিন চার পুরুষকে পর্যায়ক্রমে ঈমানের দাওয়াত দিয়ে আসছি।

এ সুদীর্ঘকাল দাওয়াত দেয়ার পর আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা হল, প্রত্যেক পরিবারের নতুন প্রজন্ম বিগত প্রজন্মের চেয়ে অধিক কপট, নিষ্ঠুর, নির্দয় ও হিংস্র হয়ে আসছে। এরা আমাকে প্রতিহত করার জন্য, আমার

দাওয়াতের আহ্বানকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য অভিনব পদ্ধতিতে আমার উপর নির্যাতন চালায়। তাদের নিষ্ঠুরতা, কপটতা ও হিংস্রতা উত্তরোত্তর যেভাবে বেড়ে চলছে আমি তাতে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়লাম।

একদিন আল্লাহর নিকট অভিযোগ তুলে বললাম, হে আল্লাহ! হে আমার রব! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিন-রাত দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নপ্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে। আমি যতবারই তাদের দাওয়াত দিয়েছি, যেন আপনি তাদের ক্ষমা করে দেন ততবারই তারা কানে আঙ্গুলি দিয়েছি। মুখমন্ডল কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলেছে। হঠকারিতা করেছে আর ভীষণ অহঙ্কার প্রকাশ করেছে।

আমি তাদের দলবদ্ধভাবে, পৃথক পৃথক ভাবে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বতভাবে হিদায়াত দানের চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা ঈমান আনে নি।

কখনো আমি তাদের জাহান্নামের আযাবের ভয় দেখিয়েছি। কখনো জান্নাতের নেয়ামতরাজির লোভ দেখিয়েছি ও ঈমান আনতে প্রলুব্ধ করেছি। কখনো ঈমান আনার বরকতে আপনি দুনিয়াতেই যে অপার নেয়ামত দান করবেন তার আলোচনা করেছি। বলেছি, ঈমান আনলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত দিবেন। মনোরম উদ্যান আর বাগবাগিচা দান করবেন। আর দিবেন উচ্ছল নির্ঝরমালা। ফলে দুনিয়াতেই তোমরা জান্নাতের সুখ-শান্তি উপভোগ করতে পারবে।

কখনো কখনো আমি তাদের নিকট আপনার কুদরত ও শক্তির বিশদ আলোচনা করেছি। বলেছি, তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে সপ্ত আকাশকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর চন্দ্রকে আলোরূপে সৃষ্টি করেছেন আর সূর্যকে প্রদীপরূপে সৃষ্টি করেছে। তারা নিরন্তর তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে।

আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যুর সেতু পার করিয়ে আবার মাটিতেই ফিরিয়ে নিবেন। তারপর আবার তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকেই পুনরুজ্জীবিত করবেন। আর তোমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাবে। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয়

কর। তাঁর প্রতি ঈমান আন। তাঁর হুকুম মেনে নাও। কিন্তু তারা আমার কোন কথাই শোনে নি। তারা আমার প্রতি একটু কর্ণপাতও করে নি।

এতটুকুতেই তাদের মনের ক্ষোভ মেটে নি। তারা আমার বিরুদ্ধে ভয়ানক ষড়যন্ত্র শুরু করল। তারা নিজেরাতো আমাকে উৎপীড়ন করলই। তদুপরি তারা জনপদের গুণ্ডা, ষণ্ডা আর পাপাচারে নিমজ্জিত ব্যক্তিদের লেলিয়ে দিল। তারা আমাকে নির্দয় ও নির্মমভাবে মারধর শুরু করল। নির্যাতন ও নিপীড়ন শুরু করল।

এরপর একদিন শুনতে পেলাম, তারা সবাই এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, তারা তাদের মূর্তি ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে কোন অবস্থায়ই পরিত্যাগ করবে না। এর জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব কিছু করতে তারা প্রস্তুত। তারা কিছুতেই আমার কথা মানবে না।

আমি অনুভব করলাম, দিনের পর দিন পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে যাচ্ছে। হতাশার অন্ধকার যেন আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে। যে দিকেই আমি যাই সে দিক থেকেই লাঞ্ছনার কথা শুনতে পাই।

এর মধ্যেই আমার সম্প্রদায়ের কিছু লোক একদিন আমাকে পথে পেয়ে বলল, হে নূহ! আমাদের সাথে তুমি অনেক ঝগড়া করেছ। অনেক বাকবিতণ্ডা করেছ। এবার এ ঝগড়ার পালা শেষ কর। আল্লাহর যে আযাবের প্রতিশ্রুতি তুমি আমাদের দিয়ে আসছ পারলে তা নিয়ে আস।

আমি তাদের দুঃসাহস ও বোকামী দেখে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। কী বলব, কী উত্তর দিব, কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমার চিন্তাশক্তিও যেন তার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ কাটালাম। তারপর বললাম, আল্লাহ ইচ্ছে করলে সে আযাব অবশ্যই আনয়ন করবেন। আর তোমরা তাঁকে প্রতিহত করতে পারবে না।

কিন্তু আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা এতই কপট ও দুষ্ট প্রকৃতির যে তারা আমার কথা মানল না। আমাকে মিথ্যাবাদী বলে চ্যালেঞ্জ করতে লাগল।

এরপর আমি আর নিজেকে কোনভাবেই স্থির রাখতে পারলাম না। সাড়ে নয়শত বৎসরের নিপীড়িত নির্যাতিত অন্তরে যেন হাহাকার বয়ে যেতে লাগল। আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে একেবারে চুরমার হয়ে গেল। আমার

দু'চোখ দিয়ে অনবরত অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে অশ্রুর যেন শেষ নেই। আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে বললাম, হে আমার রব! আমাকে সাহায্য করুন। কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।

দয়াময় আল্লাহ আমাকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য ওহী প্রেরণ করলেন। বললেন, হে নূহ! যারা ঈমান আনার ছিল তারা ঈমান এনে ফেলেছে। এদের পর আর কেউ ঈমান আনবে না। অতএব, তাদের কার্যকলাপে আর দুঃখিত হয়ো না। আর অস্থির হয়ো না।

আল্লাহর এই শান্তনাময় বাণী শুনে আমি বুঝলাম, আল্লাহ আমাকে যে মহান দায়িত্ব দিয়েছেন, তা পালনে আমি কোন ত্রুটি করি নি। বরং আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের হঠকারিতা, অবাধ্যতা ও হৃদয়ের পঙ্কিলতার কারণেই হিদায়াত গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। এর পর এরা দুনিয়ায় থাকলে শুধু অনাচারই সৃষ্টি করবে। তাই আল্লাহর নিকট দু'আ করলাম। হে আমার প্রতিপালক! কাফেরদের কাউকে আর আপনি পৃথিবীতে অবশিষ্ট রাখবেন না। যদি আপনি এদের এভাবে ছেড়ে দেন, তাহলে এরা আপনার বান্দাদের গোমরাহ ও পথভ্রষ্ঠ করবে। আর পাপিষ্ঠ ও নাফরমান সন্তানসন্ততিই এরা জন্ম দিবে।

আল্লাহ তা'আলা আমার দু'আ কবুল করলেন। বললেন, হে নূহ! এ কাফের সম্প্রদায়কে আমি মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত করে শেষ করে দিব। সুতরাং আমার তত্ত্বাবধানে ওহী অনুযায়ী একটি জলযান নির্মাণ কর। এ জলযানের মাধ্যমে তুমি ও তোমার অনুসারীরা এ আযাব থেকে রক্ষা পাবে।

চিন্তার ভেলায় ভাসতে ভাসতে নূহ আ. তাঁর দীর্ঘ জীবন সফরের অনেক খানি অতিক্রম করে এলেন। যতই ভাবেন ততই অতীতের কোলে হারিয়ে যান। বহু দুঃখ কষ্টের কথা তাঁর মনের পর্দায় তিরতির করে ভাসতে থাকে।

হঠাৎ এক অনুসারীর কণ্ঠে তিনি চমকে উঠলেন। কিছুটা আত্মস্থ হয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, তুমি এসেছো। শোন, আল্লাহর আযাব সমাগত। মহাপ্লাবনে দুনিয়া ভেসে যাবে। দুনিয়াতে কোন কাফেরের আর ঠাঁই নেই। আল্লাহর নির্দেশে আমি এ জলযান তৈরী করছি। প্লাবনের সময়

আমরা এ জলযানে আরোহন করে আত্মরক্ষা করব। সুতরাং সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলবে।

অনুসারী চলে গেলে নূহ আ. আবার জলযান তৈরীতে আত্মমগ্ন হয়ে পড়লেন। শাল কাঠ দিয়ে তিনি তা তৈরী করছেন। দেখতে দেখতে কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি ৩০০ গজ দীর্ঘ, ৫০ গজ প্রস্ত, ৩০ গজ উঁচু ও ৩ তলা বিশিষ্ট এক বিশাল জলযান তৈরী করলেন।

তারপর এল সেই প্রতিশ্রুত দিবস। ভূপৃষ্ঠ ফেটে ফেটে পানি উথলে উঠতে লাগল। ঘন কালমেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। শুরু হল বৃষ্টি। মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে তো হচ্ছেই। থামার আর নাম নেই।

সেদিনটি ছিল ১০ই রজব। নূহ আ. তাঁর আশিজন অনুসারীকে নিয়ে জলযানে আরোহন করলেন। আল্লাহর নির্দেশে প্রত্যেক প্রাণী এক এক জোড়া করে জলযানে তুলে নিলেন।

চারদিক পানি আর পানি। থৈ থৈ পানিতে চারদিক ভেসে গেল। প্রবল ঝড়ঝঞ্চা বইতে লাগল। পাহাড়ের চূড়া ছাড়িয়ে প্রায় ১৫ গজ উঁচু হয়ে এক একটি ঢেউ আসতে লাগল। এ ভয়স্কর ঝড়ের মাঝে হেলে দুলে নূহ আ. এর জলযানটি ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল। নূহ আ. এর অনুসারী এ আশিজন মানুষ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন মানুষ বাকি রইল না। একাধারে ৬ মাস এ ভয়স্কর ঝড়ঝঞ্ঝা চলল।

তারপর আল্লাহ তা'আলা যমীন ও আসমানকে হুকুম দিলেন। যমীন তার পানি ভূগর্ভে চুষে নিল। আসমান তার পানি ধারণ করল। মহাপ্লাবন থেমে গেল। নূহ আ. এর জলযানটি ভাসতে ভাসতে আরমেনিয়ার সীমন্তে অবস্থিত আরারাত পর্বতমালার অন্যতম পর্বত জুদীতে গিয়ে ভিড়ল।

আর সেই দিনটি ছিল ১০ই মহররম। আশুরার দিন। দীর্ঘ ৬ মাস পর নূহ আ. তাঁর সাথীদের নিয়ে পৃথিবীর মাটিতে পা রাখলেন। সে দিন নূহ আ. আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রোযা রাখলেন। তার অনুসারীরাও রোযা রাখলেন।

নূহ আ. এর জলযানের এই ঈমানদীপ্ত ঘটনাটির বর্ণনা কুরআনুল কারীমের

বারতম পারার সূরা হূদ-এ রয়েছে।

জলযানের এই আরোহীদের কারোই আর কোন সন্তান হয়নি। নূহ আ. এর তিন পুত্র হাম, সাম, ও ইয়াফেসের সন্তান-সন্ততি দ্বারাই আবার পৃথিবী আবাদ হয়েছে। আবার পৃথিবী কোলাহলমুখর হয়ে উঠেছে। তাই নূহ আ. কে দ্বিতীয় আদম নামে অভিহিত করা হয়।

আস্‌হাবুল হিজ্‌র*

সরীসৃপের মত এঁকেবেঁকে পথটি চলে গেছে সুদূর ইয়ামেনের দিকে। মরুর বুক চিরে, পাহাড় আর টিলার পাশ কেটে, কাঁটাগুল্মের মাঝ দিয়ে চলে গেছে। মাঝে মাঝে আছে চড়াই-উৎরাই। হিজর থেকে সোজা ইয়ামেনে যাওয়া যায় এ পথ ধরেই। হিজাজের লোকেরাও ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এ পথ ধরেই ইয়ামেনে যাতায়াত করে।

আজ এ পথ ধরেই ইয়ামেনের দিকে যাচ্ছে একদল মানুষ। ছোট্ট একটি কাফেলা। কেই পদব্রজে, কেউ বাহনে চড়ে। সবার সাথেই যথাসাধ্য সামানপত্রের বোঝা। এঁরা জন্মভূমি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আর কখনো হিজরে ফিরে আসবে না। জন্মভূমির মায়ার হাতছানি কখনো তাঁদের হৃদয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করবে না। বিধ্বস্ত অভিশপ্ত হিজরে ফিরে আসার কোন প্রশ্নই উঠে না।

আল্লাহর নবী হযরত সালেহ আ. এর নেতৃত্বে তাঁরা যাচ্ছে। বড় ভাল মানুষ, অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ মানুষ হযরত সালেহ আ.। শৈশব আর কৈশোরে আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠির লোকেরা তাঁকে নিয়ে কতো অহঙ্কার করত। কতো বিস্মিত হত। ভাবত, হ্যাঁ, ভবিষ্যতে এ ছেলেই আমাদের গোত্রের অবিসংবাদিত নেতা হবে। জাতির কর্ণধার হবে। সমূদ জাতিকে উন্নতির উচ্চ মার্গে পৌছাতে পারবে। তাঁর পিতা-মাতা ও আত্মীয়

* আসহাবুল হিজর : অর্থ হিজরের অধিবাসিগণ। মদীনা থেকে ১৫০ মাইল উত্তরে সিরিয়ার পথে অবস্থিত একটি পাহাড়ী উপত্যকার নাম হিজর। এখানে সামূদ জাতি বসবাস করত। হযরত সালেহ আ. তাদের নবী ছিলেন। হিজরের অধিবাসীদেরকেই আসহাবুল হিজর বলা হয়।

স্বজনরা তাঁকে নিয়ে স্বপ্নীল সপ্নে বিভোর থাকত। চিন্তার পাতায় রং তুলি নিয়ে তাঁকে ঘিরে বর্ণিল ছবি আঁকত।

সালেহ আ. অনুসারীদের নিয়ে ইয়ামেনের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। ধীরে ধীরে দৃষ্টি-সীমার বাইরে চলে যাচ্ছেন। জন্মভূমি হিজরের ধ্বংসস্তুপগুলো আবছা আবছা নজরে পড়ছে। দুঃখ-বেদনায় বারবার তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে। কোটরে এসে জমায়েত হয়েছে ছলছল অশ্রু। আজ তাঁর মনে পড়ছে বহু কথা। হৃদয় পর্দায় ভেসে উঠছে অনেক ছবি।

তাঁর জাতি সামূদের কী না ছিল! আবাসভূমির চারদিকে ছিল সবুজ শ্যামল আর উচ্ছল প্রাণের ছোঁয়া। বাগান আর শস্যভূমির মাঝে মাঝে ছিল নির্ঝরমালা। ছল ছল ছলাৎ তান তুলে শুভ্র ফেনার মুকুট মাথায় পরে নৃত্যের তালে তালে পানির স্রোত বইত সারাক্ষণ। স্বচ্ছ সুন্দর নির্মল সঞ্জীবনী সে পানি। বাগানে বাগানে হরেক রকমের সুমিষ্ট ফলের ভারে ভারসাম্য হারিয়ে ডালপালা সব নুয়ে পড়ত। ঝিরঝিরে বাতাসের দোলায় দুলতে থাকত ডালপালা আর পত্রপল্লব। আনন্দে নেচে উঠত হৃদয়-মন।

আল্লাহ তাদেরকে অপার নির্মাণশিল্পের যোগ্যতা দান করেছিলেন। পাথরের পাহাড় কেটে কেটে সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করত। ভারি চমৎকার ছিল তাদের প্রাসাদগুলো। বিস্ময়কর ছিল তাদের শিল্প সৌন্দর্যবোধ আর কারুকার্যের অভিজ্ঞতা। আল্লাহ যেন তাদের হাতে লৌহবৎ পাথরকে মোমের মত নরম করে দিয়েছিলেন। তা দ্বারা তারা বিস্ময়কর কতো কিছু বানাত। কেউ তাদের শহরে প্রবেশ করলে বিস্ময়ে হতবাক ও বিমূঢ় হয়ে যেত। ভাবত, পাহাড় কেটে কেটে এতো সুন্দর মনোরম প্রাসাদ কি মানুষ বানাতে পারে? নিশ্চয় এটা মানুষের কাজ নয়। এটা জিনদের কারিশমা। জিনদের কাণ্ড কারখানা।

আল্লাহর অপার অফুরন্ত নেয়ামত পেল সামূদ জাতি। ভোগ বিলাস আর আনন্দ উল্লাসে আত্মহারা হয়ে গেল। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করল না। শুকরিয়া জ্ঞাপন করল। আল্লাহর কুফুরিতে লিপ্ত হল। হাতে গড়া প্রতিমার পূজা শুরু করল। ঘরে ঘরে সুন্দর বেদীতে প্রতিমা আসন গেড়ে বসল। যেন প্রতিমাই তাদের সৃষ্টিকর্তা। প্রতিমাই তাদের লালনকর্তা। প্রতিমাই তাদের সুখ-দুঃখের মালিক।

সালেহ আ. কে নিয়ে তাঁর বাহনটি ধীরে ধীরে চলছে। হিজর ছেড়ে অ-নে-ক দূরে চলে এসেছেন। কিন্তু অতীতের স্মৃতি যেন তিনি ছাড়তে পারছেন না। বার বার তাঁর মন মুকুরে এসে উঁকি দেয় অতীতে বহু ঘটনা। বহু কাহিনী।

হায়! তাদের কতো বুঝালাম। তাদের পিছনে কতো মেহনত করলাম। আল্লাহর শক্তির কথা বুঝালাম। প্রচণ্ড ক্ষমতার কথা বুঝালাম। আদ জাতির ধ্বংসের কথা তাদের সামনে বারবার তুলে ধরলাম। নূহ আ. এর সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কথাও তাদের বললাম। কিন্তু না, তারা আমার কথা কানেও তুলল না।

তারা হয়তো ভেবেছিল, ধ্বংস তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। নূহ আ. এর সম্প্রদায়ের লোকেরা উপত্যকায় থাকত। তাই প্রবল প্লাবন তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আর আদ জাতি থাকত সমতল ভূমিতে। তাই তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু আমরাতো পাথরের পাহাড়ের শরীর কেটে আবাসস্থল নির্মাণ করেছি। সুতরাং আমরা চির নিরাপদ। চির আতঙ্কমুক্ত। আমাদের কেউ ধ্বংস করতে পারবে না।

কতো বুঝালাম। কিন্তু আমার কথা তার শুনল না। আমাকে নবী হিসাবেও মেনে নিল না। আমাকে নিয়ে উপহাস শুরু করল। ঠাট্টা মশকারা আরম্ভ করল। বলল, সালেহ! তুমি ছিলে বুদ্ধিতে সেরা। এতো বোকা হলে কিভাবে? কেবল পরকাল আর পরকাল। রাখ তোমার ঐ পরকাল। আমরা তা বিশ্বাস করি না। দুনিয়ার এ জীবনই একমাত্র জীবন। মৃত্যুর পর আমরা ধূলিবালি আর মাটির সাথে মিশে যাব। সুতরাং ঐ গালগল্প রেখে আমাদের অনুসরণ কর।

তাদের এ ধরনের কথা আমি বহু শুনেছি। অনেক সয়েছি। কখনো নিরাশ হইনি। তাদের বিদ্রুপ আর তিরস্কার আমি সহজেই হজম করে নিয়েছিল। তাদের বুঝাবার চেষ্টা করেছি। তারা আমার সহনশীতাকে দুর্বলতা ভেবেছে। আমাকে গালমন্দ করেছে। মেনে নেয় নি আমার কথা।

একদিনের কথা বেশ মনে পড়ে। সে দিন আমি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে কথা বলছিলাম। কথার পিঠে পিঠে কথা এগিয়ে চলল। অনেক কথা হল। যুক্তি তর্কে তাদের হারিয়ে ফেললাম। তারা লা-জওয়াব হয়ে গেল।

অপারগতার জ্বালায় তিরতির করে কাঁপতে কাঁপতে তারা মজবুত হয়ে বসল। একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলল, দেখ সালেহ! তুমি কিন্তু আমাদের মতই একজন মানুষ। নবী হলে আমাদের তার নিদর্শন দেখাও। তাহলে আমরা তোমার কথা মেনে নিব।

আমি তখন কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। ক্ষণকাল ভেবে চিন্তে আল্লাহর উপর ভরসা করে বললাম, ঠিক আছে নিদর্শন দেখাব, যদি তোমরা আমাকে মেনে নাও। বল, কোন্ নিদর্শন তোমরা দেখতে চাও?

তারা বলল, বেশ তাহেল ঐ যে পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে। তার শরীর ফুঁড়ে একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী বের করে আন। উষ্ট্রী বেরিয়েই সন্তান প্রসব করবে। যদি তা পার তাহলে বুঝব, তুমি সত্যই আল্লাহর নবী।

আমি তাদের কথা মেনে নিয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলাম। আল্লাহ আমার প্রার্থনা কবুল করলেন। সাথে সাথে পাহাড় ফুঁড়ে এক ইয়া বড় উষ্ট্রী বেরিয়ে এল। তারপরই উষ্ট্রীটি একটি সন্তান প্রসব করল।

জোন্দে ইবনে আমর। সরল প্রকৃতির মানুষ। মনে তাঁর কোন কপটতা নেই। হৃদয়ে কোন শঠতা নেই। সত্য তাঁর নিকট বিকশিত হয়ে গেলেন। সাথে সাথে ঈমান এনে মুসলমান হয়ে গেল। কিন্তু অন্যরা বেঁকে বসল। তাদের শত্রুতা ও বিদ্বেষ আরো প্রকট আকার ধারণ করল। তারা ঈমান আনল না। আমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠল। আমি তাদের বলে দিয়েছিলাম, দেখ, এটা কিন্তু আল্লাহর প্রেরিত উষ্ট্রী। তোমরা এর ক্ষতির চিন্তা করো না। কূপের পানি একদিন এ উষ্ট্রী পান করবে, আরেকদিন অন্য পশুরা পান করবে।

আমার কথা তারা মেনে নিয়েছিল। এভাবেই কিছুদিন চলল। কিন্তু তারপরই আবার ষড়যন্ত্র শুরু হল। উষ্ট্রীকে ঘিরে ষড়যন্ত্র করল। তাকে হত্যা করার নীল নকশা তৈরী করে সত্যই একদিন সকালে তাকে হত্যা করল। উষ্ট্রী-ছানাটি তার মায়ের করুণ অবস্থা দেখে চিৎকার করতে করতে পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল।

আমি শুনে তো একেবারে হতবাক। বিস্ময়ে বিমূঢ়। আমার চিন্তাশক্তি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। জিহ্বা একবারে কাঠ হয়ে গেল। স্থাণুর ন্যায় নির্জীব নিস্পন্দ হয়ে গেল আমার অঙ্গপ্রতঙ্গ। দীর্ঘক্ষণ পর যখন আমার

বোধ শক্তি ফিরে এল আমি বললাম, আমি তোমাদের যা করতে নিষেধ করেছিলাম তোমরা তাই করলে। আল্লাহর উষ্ট্রীকে হত্যা করে ফেললে। তোমাদের আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহর গযব সমাগত। তিন পর তোমরা সে গযবে নিপতিত হবে।

তাদের উগ্রতা, হঠকারিতা আর অবাধ্যতার মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলল। তারা আমাকেও সপরিবারে হত্যার ষড়যন্ত্র শুরু করল। আহ! কতো বুঝালাম, হিদায়াতের পথে কতো আহ্বান করলাম! কিন্তু তারা শুনল না। গোমরাহী, ভ্রষ্টতা আর অন্ধকার যেন তাদের মন ও মননে, চিন্তা ও চেতনায় এমনকি রক্তের কণিকায় কণিকায় মিশে গেছে।

আযাবের আলামত প্রকাশিত হতে লাগল। প্রথম দিন ভয়ার্ত ব্যক্তির ন্যায় তাদের চেহার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন তাদের চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করল। তৃতীয় দিন কাল হয়ে গেল। তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রতিশ্রুত সময় এগিয়ে এল।

ভয়ঙ্কর তীব্র ধ্বনি উত্থিত হল। হৃদয় ফেটে মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। যে যেখানে ছিল সেখানে পড়েই মৃত্যুবরণ করল। দালান কোঠা আর প্রাসাদগুলো কাঁপতে কাঁপতে ধ্বসে পড়ল। গাছপালা আর বাগানগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

চারদিকে ধ্বংসস্তুপ আর ধ্বংসস্তূপ। সাজানো সুন্দর মনোরম বসতি সময়ের একটু ব্যবধানে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হল। কোলাহল মুখর জনবসতিটি চিরদিনের জন্য গভীর নিরবতায় ডুবে গেল।

ছোট কাফেলাটি যাচ্ছে। মরুর পথে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে কাফেলাটি এগিয়ে যাচ্ছে। মাত্র একশত বিশ জনের কাফেলা। বিশাল সামূদ জাতির মাঝে হাতে গোনা এ কয়েকজন মানুষই জীবিত রইল। এরা সালেহ আ. এর প্রতি ঈমান এনেছিল। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। সালেহ আ. কে নিয়ে তাঁর বাহনটি এগিয়ে যাচ্ছে। সম্মুখ পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাঁর মননশক্তি সামনে এগুচ্ছে না। বার বার পিছনে ফিরে যাচ্ছে। স্মৃতির পাতাগুলো বারবার তিরতির করে তার মনশ্চক্ষুতে ভেসে উঠছে। তিনি অতীতের স্মৃতি মন্থনে হারিয়ে যাচ্ছেন।

কাফেলাটি অ-নে-ক দূর এগিয়ে এসেছে। আরব উপদ্বীপের দক্ষিণে

ইয়ামেনের সীমানায় প্রবেশ করেছে। তবুও তার গতি থেমে নেই। চলছে তো চলছে। এদিকে সালেহ আ. এর শরীর আর তাঁকে বহন করতে পারছে না। বিরামহীন কঠোর পরিশ্রম, দীর্ঘ পথের অসহনীয় ক্লান্তি তাঁর দেহের জীবনীশক্তিকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছে। তবুও তাঁর মনোবল অফুরন্ত। অসীম। আল্লাহর পথে জীবন কুরবান করতে ব্যগ্র অস্থির।

ইয়ামেনে পৌছার পর তিনি আর বেশী দিন মায়াময় পৃথিবীতে থাকতে পারলেন না। আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে পরলোকে চলে গেলেন। তাঁর ইন্তেকালে, তাঁর বিচ্ছেদ বেদনায় তাঁর অনুসারীরা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। পরিশেষে তাঁর কাফন ও দাফনের আয়োজনে করল। তিনি যে স্থানটিতে ইনতেকাল করেছিলেন আজো তা হাযরামউত নামে খ্যাত হয়ে আছে। হিজরবাসীর এই ঘটনাটির বর্ণনা কুরআনুল কারীমের চৌদ্দতম পারার সূরা-হিজর-এ বর্ণিত হয়েছে।

হিজর নামটি উচ্চারিত হলে আজো মানসপটে সেই অভিশপ্ত লোকগুলোর কথা মনে পড়ে, যারা সালেহ আ. কে নানা ভাবে কষ্ট দিয়েছিল। আল্লাহ প্রদত্ত উষ্ট্রীকে যারা নির্মম ভাবে হত্যা করেছিল। যারা সালেহ আ. কেও হত্যার পাঁয়তারা করেছিল। তারপর আল্লাহর গযবে নিপতিত হয়ে দুনিয়ার রংমহল থেকে চির বিদায় নিয়েছিল।

আস্‌হাবুর রাস্‌স*

সামূদ জাতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর মাত্র এক শত বিশজন লোক সালেহ আ. এর সাথে ইয়ামেনে এসেছিলেন। তাঁদের আশা ছিল বিরাট। মনোবল ছিল আকাশ ছোঁয়া। প্রতিজ্ঞা ছিল নিটোল। কিন্তু সালেহ আ. এর ইনন্তেকালের পর তাঁদের জীবনের গতি যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। জীবনের স্বপ্নীল স্বপ্নগুলো যেন ভেঙ্গেচুরে খানখান হয়ে গেল। কিন্তু প্রকৃতির ধারায়, দিন ও রাতের আবর্তে তাঁদের সব সয়ে গেল। স্বাভাবিক। একেবারে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা তাঁদের মাঝে ফিরে এল।

হাযরামউতের অদূরে হাছুরা নামক এক স্থান। একটি গভীর কূপ সেখানে বিদ্যমান। প্রচুর সুমিষ্ট পানি সে কূপে। টলটলে শীতল পানি দেখলেই তৃষ্ণা পালাই পালাই করতে থাকে। সালেহ আ. এর অনুসারীরা সে কূপের পাশে এসে বস্তি স্থাপন করল এবং সালেহ আ. এর প্রদর্শিত পথেই তাঁরা জীবন পরিচালিত করতে লাগল। কূপের সুমিষ্ট পানি তাঁরা পান করে। কৃষি ক্ষেত্রে তার পানি সিঞ্চন করে। গৃহপালিত পশুদের তার পানি পান করায়। কিছু দিন যেতে না যেতেই তাদের জীবনধারা পাল্টে গেল। কৃষি ক্ষেত্রে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হতে লাগল। গাছের ডালে ডালে থোকায় থোকায় ফল

---

* আসহাবুর রাস্‌স : অর্থ কূপের অধিবাসীগণ। ইয়ামেনের হাযরামউতের অদূরে হাছুরা নামক স্থানে কূপের নিকট সামূদ জাতির অবশিষ্ট লোকেরা বসবাস করত। তাই তাদেরকে আস্‌হাবুর রাস্‌স বলা হয়। কারো মতে আরবের ওনায়জা নগরীর ৩৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মধ্য নজদের কাসিম জেলায় আর্‌-রাস নামক একটি মরুদ্যান শহর বিদ্যমান। এ অঞ্চলে অনেক প্রাচীন কূপের চিহ্ন রয়েছে। মক্কা ও বসরার রাস্তায় তা অবস্থিত। সামূদ জাতির লোকেরা এখানে এসে শহরের পত্তন ঘটিয়েছিল। তাদেরকে আসহাবুর রাস্‌স বলা হয়।

ঝুলতে লাগল। পালিত পশুতে গোশালা ভরে গেল। কূপটি তাঁদের জীবন ও সভ্যতার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গেল। ধীরে ধীরে তাঁদের জনসংখ্যা বাড়তে লাগল। দূর দূরান্তের মানুষরাও এসে এখানে বসবাস শুরু করল। ফলে ছোট্ট বস্তিটি বিরাট আকার ধারণ করল। একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করল। এ রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য, শান্তি ও সম্প্রীতির সাথে মিলেমিশে থাকার জন্য সবাই মিলে একজনকে তাদের বাদশাহ নির্বাচন করল।

বাদশাহ ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ। জ্ঞানে গুণে শিষ্টাচারে তাঁর কোন কমতি ছিল না। তাঁর মধুর ব্যবহারে সবাই তুষ্ট। অধীনস্ত সবাইকে তিনি মনে প্রাণে ভালবাসেন। সবার কল্যাণ কামনায় অধীর অস্থির হয়ে ছুটে যান। কারো বিপদাপদ বা অসুখের সংবাদ পেলে সাথে সাথে তাকে দেখতে যান। সেবা শুশ্রূষা করেন।

একদিন হঠাৎ বাদশাহ ইন্তেকাল করলেন। ফলে গোট শহরে শোকের ছায়া নেমে এল। যেন স্বজন হারানোর বেদনায় সবাই ব্যাকুল। অস্থির। গোটা শহরে কান্নার রোল পড়ে গেল। প্রতিটি ঘর থেকে কান্নার করুণ আওয়াজ উত্থিত হতে লাগল।

শয়তান মানুষের চির শত্রু। মানুষকে জাহান্নামে নেয়ার ইস্পাত কঠিন প্রতিজ্ঞা করেই সে দুনিয়াতে এসেছে। সালেহ. আ. এর অনুসারীদের পিছু নিয়েছিল অনেক দিন আগে থেকেই। তাদের গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করেছে অনেক পদে পদে কিন্তু সফল হতে পারেনি। বার বার ব্যর্থ হয়েছে। তবে মোটেই যে সফল হয় নি তা নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের ঈমানকে দুর্বল করে ফেলেছে। ধর্মের বিধিবিধান পালনে তাদের মাঝে উদাসীনতা ও অলসতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

বাদশাহর প্রতি জনসাধারণের এই মহব্বত ও ভালবাসাকে শয়তান কাজে লাগাতে চাইল। অনেক চিন্তা ভাবনার পর একদিন শয়তান শোকাতুর মানুষগুলোর নিকট মৃত বাদশাহর আকৃতি ধারণ করে উপস্থিত হল। মৃত বাদশাহকে সশরীরে দেখে সবাই বিস্ময়ে বিস্ফোরিত নেত্রে চেয়ে রইল। সবার মনে অযুত প্রশ্নের আনাগোনা। এ কী! মৃত বাদশাহ পৃথিবীতে ফিরে এল কিভাবে! মানুষ কি মৃত্যুবরণ করার পর জীবিত হতে পারে? বুদবুদের মত প্রশ্নের পর প্রশ্ন যখন তাদের অন্তরে ভাসতে লাগল, শয়তান তখন

মিটিমিটি হেসে বলল, আমি কয়েক দিনের জন্য তোমাদের থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। তোমাদের শোকাতুর অবস্থা দেখে আমি আর থাকতে পারিনি। তাই চলে এলাম। আর কখনও তোমাদের ফেলে চলে যাব না।

জনসাধারণ তাঁকে পেয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করল। শহরের আপামর জনতা সেখানে উপস্থিত হল। ছদ্মবেশী শয়তান তাতে উপস্থিত হয়ে বলল, ভাইয়েরা আমার! আমি তোমাদের থেকে দূরে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারিনি। তাই আবার ফিরে এসেছি। আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসা ও মহব্বত দেখে আমি বিস্মিত। তাই তোমাদের প্রতি আমার হৃদয় নিংড়ানো ধন্যবাদ।

আমি তোমাদের নিকট একটি প্রতিশ্রুতি চাই। তা হল, তোমরা আমার কথা শুনবে। আমার আনুগত্য করবে। আমার নির্দেশ মত চলবে। আমি যা বলি নির্দ্বিধায় তা পালন করবে। তাহলে আমি তোমাদেরকে উন্নতির স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারব।

সমেবেত জনতার স্বতঃস্ফূর্ত হর্ষধ্বনি উত্থত হল। কেঁপে উঠল আকাশ বাতাস আর উন্মুক্ত প্রান্তর। সবাই হাত নেড়ে নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করল।

এবার শুরু হল শয়তানের অভিযান। সবাইকে দ্রুত গোমরাহির পথে নিয়ে চলল। জাহান্নামের পথে নিয়ে চলল। চারদিকে আল্লাহর নাফরমানী আর অবাধ্যতা ছড়িয়ে পড়ল। সবাই পাপকাজে নিমজ্জিত হয়ে গেল। নানা শিরক আর কুফুরী তাদের গ্রাস করে নিল।

ছাফওয়ান ইবনে হানযালা। অত্যন্ত ভাল মানুষ। অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান মানুষ। সবাই তাঁকে চিনে। সবাই তাঁকে ভালবাসে। সবার সাথে তাঁর উষ্ণ মেলামেশা। শয়তানের খপ্পর থেকে এ জনবসতির লোকদের উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকেই নির্বাচন করলেন। তাঁকে নবীরূপে গ্রহণ করে নিলেন। তারপর নির্দেশ দিলেন, যাও তাদের তাওহীদের শিক্ষা দাও। শিরক ও কুফরী থেকে বাঁচাও।

শুরু হল এবার আলো আঁধারের সংঘাত। শুরু হল সত্য মিথ্যার লড়াই। ছাফওয়ান ইবনে হানযালা আ. মানুষদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেন আর বাদশাহীরূপী শয়তান মানুষদেরকে অন্ধকারের দিকে আহ্বান করে। কিন্তু কেউ ছাফওয়ান ইবনে হানযালা আ. এর কথা শুনে না। তাঁর

দিকে ফিরেও তাকায় না। গোমরাহীর পথে চলতে চলতে হিদায়াতের আলো গ্রহণের যোগ্যতাও তাদের নিঃশেষ হয়ে গেছে।

একদিন বাজারে জনাকীর্ণ লোকসমাবেশে দাঁড়িয়ে ছাফওয়ান ইবনে হানযালা আ. উপদেশ দিচ্ছিলেন। তাওহীদের বাণী শোনাচ্ছিলেন। তিনি তখন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বললেন, তোমরা যে বাদশাহর কথা শুনে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে চলছ সে কিন্তু শয়তান। মৃত বাদশাহর রূপ ধরে তোমাদের ধোঁকা দিচ্ছে। প্রবঞ্চনা দিচ্ছে। সাবধান! তোমরা তার কথা শোন না। তার আনুগত্য করো না।

এ কথা বলার সাথে সাথে শয়তানের অন্ধ অনুসারী কিছু লোক তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নির্মমভাবে তাঁকে আঘাতের পর আঘাত করতে লাগল। হাতের কাছে যা পেল তা দিয়েই তাঁকে মারতে লাগল। মারতে মারতে তাঁকে শহীদ করে ফেলল। কুরআন শরীফের ছাব্বিশতম পারার সূরা-ক্বাফে আসহাবুর রাস্ এর ঘটনার সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

নবীর গায়ে হাত তোলা মারত্মক অপরাধ। অমার্জনীয় পাপ। আল্লাহ তাদের এ অপরাধকে ক্ষমা করলেন না। গযব নেমে এল তাদের উপর। ঘর বাড়ী ধ্বংস হয়ে গেল। গাছপালা আর বাগবাগিচা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। একটি মানুষও আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা পেল না। চির স্তব্ধ হয়ে গেল কোলাহল মুখর এ জনবসতিটি। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রইল ধ্বংসস্তূপ আর ধ্বংসস্তূপ।

আস্‌হাবুল আইকা*

আল্লাহর নির্দেশ এল, হে শুয়াইব! ঐ ঘন বনে যে লোকেরা বাস করে তাদের নিকট যাও। তাদের হিদায়াত দান কর। তাদের তাওহীদের শিক্ষা দাও।

শুয়াইব আ. সেই ঘন বনের পথে রওয়ানা হলেন। সাথে কয়েকজন অনুসারী। কয়েকজন মুসলমান। মাদইয়ান ছেড়ে যাওয়ার সময় তাঁর হৃদয়ে এক হাহাকার তোলপাড় সৃষ্টি করল। টপ্‌টপ্ করে গড়িয়ে পড়তে লাগল অশ্রুধারা। আবেগে কণ্ঠ তাঁর জড়িয়ে আসছে। বেদনার আঘাতে হৃদয় তাঁর জর্জরিত হয়ে গেছে। বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তুপ মাদইয়ান নগরীর দিকে তাকিয়ে রইলেন বিস্ফারিত নেত্রে।

হৃদয় পর্দায় ভেসে বেড়াচ্ছে বহু চিত্র, বহু ছবি। আজ তাঁর বার বার মনে পড়ছে বহু কথা। হযরত ইবরাহীম আ. এর যুগের কথা। তাঁর তৃতীয় স্ত্রী কাতুরার গর্ভে মাদইয়ান নামের এক পুত্র জন্মলাভ করেছিলেন। মাদইয়ান তাঁর স্ত্রী পুত্র ও পরিজন নিয়ে শামে থাকেন নি। বৈমাত্রেয় ভাই ইসমাইল আ. কে তাঁর খুব ভাল লাগত। তাঁর পাশে থাকার জন্য একদিন তিনি

* আসহাবুল আইকা ঃ অর্থ ঘন বনের অধিবাসীগণ। সিনাই পর্বতের দক্ষিণ পূর্বে লোহিত সাগরের অববাহিকায় মাদায়েন অবস্থিত। মাদায়েনের অদূরে ছিল এক ঘন বন। হযতর শুয়াইব আ. মাদায়েনবাসী ও ঘন বনবাসীদের নিকট প্রেরিত হয়ে ছিলেন। এ ঘন বনের অধিবাসীদের আসহাবুল আইকা বলা হয়।

হেজাজের পথে রওনা হলেন।

চলতে চলতে শাম ছেড়ে যখন লোহিত সাগরের পূর্বতীরের পথ ধরে হেজাজের দিকে আসছিলেন, তখন শামের পরই সমুদ্রের অদূরে এক মনোরম স্থান তাঁর বেশ ভাল লাগল। যাত্রা বিরতি দিয়ে সেখানে নেমে পড়লেন। ঘুরে ফিরে সব কিছু দেখলেন। আবহাওয়া, পরিবেশ, পরিস্থিতি সব কিছু অবলোকন করলেন। এ স্থানের প্রতি তাঁর আর্কষণ আরো তীব্র হল। স্থানটি তাঁর হৃদয় জয় করে নিল। তিনি আর সামনে অগ্রসর হলেন না। এখানেই সবাইকে নিয়ে বসতি স্থাপন করলেন। সময়ের তালে তালে তাঁর সন্তানসন্ততি বৃদ্ধি পেয়ে এক বিরাট গোত্রের রূপ ধারণ করল। তাঁর নামেই এ স্থানটি মাদইয়ান নামে খ্যাতি লাভ করল ও নগরীর রূপ ধারণ করল।

মাদইয়ান নগরীর অধিবাসীদের জীবনে কোন অভাব ছিল না। কোন অভিযোগ ছিল না। আল্লাহর অপার নেয়ামতে বেশ সচ্ছল অবস্থায়ই তাদের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। ব্যবসা বাণিজ্যে ছিল তারা দারুণ চৌকস। অত্যন্ত পারঙ্গম। কাফেলার পর কাফেলা নিয়ে তারা শামের বাজারে যায়। অত্যন্ত দাপটের সাথে ব্যবসা করে। ঈর্ষণীয় অর্থ উপার্জন করে। মিশরেও তাদের যাতায়াত অবাধ। মাইদয়ানের প্রত্যেক পরিবারই বহু অর্থ সম্পদের মালিক। প্রত্যেকের আছে বিশাল মনোমুগ্ধকর বাড়ি। অজস্র গবাদি পশু ও বিস্তৃত বাগবাগিচা।

কিন্তু অর্থের এ আগমন তাদের জীবনে অনেক অনর্থ বয়ে আনল। ভোগ বিলাস আর আনন্দ উল্লাসের তোড়ে তারা তাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীম আ. এর কথা ভুলে গেল। মাদইয়ানের জীবনাদর্শ ও উপদেশবাণীও ধরে রাখতে পারল না। নীতি নৈতিকতা হারিয়ে ফেলল। সততার নাম গন্ধও তাদের মাঝে বাকি রইল না।

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কথা ভুলে গেল। তাওহীদের শিক্ষা হারিয়ে ফেলল। শিরকে আকণ্ঠ ডুবে গেল। ব্যবসা বাণিজ্যে সততা ও ন্যায়নীতি নিঃশেষ হয়ে গেল। ধোঁকা আর প্রবঞ্চনা হল তাদের ব্যবসার কৌশল। কাউকে কিছু মেপে দিতে হলে কম দেয়। কিন্তু মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় মেপে নেয়।

শুধু কি তাই! তাদের মধ্য থেকে বেশ কিছু মানুষ দুর্ধর্ষ ডাকাত হয়ে গেল। এরা দলবদ্ধভাবে গাছ গাছালির আবডালে বা পাহাড়-টিলার আড়ালে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে থাকে। বাণিজ্য-কাফেলা তাদের আওতায় চলে এলেই মার মার কাট কাট রব তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। লুটে নেয় তাদের সর্বস্ব। কেউ কিছু বললেই অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত করে। নির্মমভাবে হত্যা করে। জীবন লীলার চির পরিসমাপ্তি ঘটায়। নারীর কৌমার্যের প্রতি তাদের দারুণ লোভ। রূপসী নারী পেলে তারা দিশেহারা হয়ে যায়। লুটেপুটে রক্তাক্ত করেও শান্ত হয় না তাদের পশুত্ব আর শয়তানী কামনা।

এ বংশেই হল আমার জন্ম। শৈশব থেকেই আমি এগুলো অপছন্দ করতাম। এগুলোর প্রতিবাদ করতাম। এজন্য আমাকে অনেক অনেক কথা বলেছে। অনেকে আপমান করেছে। সব কিছুই আমি নিরবে সয়েছি। মুখবুজে হজম করেছি।

আল্লাহ আমাকে অনেক নেয়ামত দান করেছেন। শৈশব থেকেই আমি ছিলাম নেহায়েত মার্জিত মিষ্টভাষী। স্থানোচিত বক্তৃতায় পারদর্শী। অসাধারণ বাকচাতুর্যে বৈশিষ্টমণ্ডিত। বড় হলে আল্লাহ আমাকে নবুওয়তের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তাদের হিদায়াতের হুকুম দিলেন। আমি তাদের বুঝালাম। অনেক ভাবে বুঝালাম। বললাম, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। মানুষকে পরিপূর্ণভাবে মেপে দাও। প্রাপ্যবস্তু কম দিয়ো না। পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। ওঁৎপেতে বসে থেকে মানুষের ধন-সম্পদ লুটে নিয়ো না। এগুলো বড়ই অন্যায় কাজ। পাপ কাজ। কিন্তু তারা আমার কথা শুনল না।

একদিন আমি তাদের উপদেশ দিচ্ছিলাম। তারা আমার সাথে তর্ক জুড়ে দিল। বলল, হে শুয়াইব! তোমার নামায কি এ নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের পূজা করত আমরা তাদের পূজা ছেড়ে দিব? অথবা আমরা আমাদের ধন সম্পদে যা খুশি তা করব না? এতো ভারি চমৎকার কথা! তোমার এ ধরনের কথা আমরা মেনে নিতে পারব না।

আমি কখনো নিরাশ হই নি। দায়িত্ব পালনে অবহেলা করি নি। আমি তাদের সত্যের দিকে আহ্বান করতে থাকলাম। কিছু কিছু লোকের চিন্তায় পরিবর্তন আসল। তারা আমার কথা শুনল। তারা প্রায়ই আমার নিকট

আসত। আমার মত চলত।

নেতৃস্থানীয় লোকেরা ব্যাপারটাকে সুনজরে দেখল না। তারা সহ্য করতে পারল না। তারা প্রহরা বসাল। কেউ আমার নিকট আসছে, এ কথা বুঝতে পারলেই তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সব কিছু লুটে নিতে লাগল। আল্লাহর পথে তারা বাধা দিতে লাগল। প্রচার করে বলতে লাগল, তোমরা যদি শুয়াইবের অনুসরণ কর, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু ঈমানের স্বাদ যাঁরা পেয়েছে তাঁদের তারা শত নির্যাতন করেও প্রতিহত করতে পারল না। দিনের পর দিন মুমিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতেই লাগল।

একদিনের কথা আমার বেশ মনে পড়ে। গোত্রের অহঙ্কারী লোকেরা আমার উপর বেশ ক্ষেপে উঠল। বলল হে শুয়াইব! তোমাকে এবং তোমার উপর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমরা আমাদের নগরী থেকে বের করে দিব। তবে হ্যাঁ, যদি আমাদের ধর্মে আস তাহলে ক্ষমা করা হবে।

আমি বললাম, পরিনতি যাই হোক আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে আসতে পারি না। তাহলে তো আমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপকারী হয়ে যাব। আমরা আল্লাহর উপরই ভরসা করলাম।

একদিন তারা আমাকে হুমকি দিয়ে বলল, হে শুয়াইব। তুমি যা বল আমরা এসব বুঝি না। তুমি তো আমাদের মাঝে খুবই দুর্বল। তোমার গোত্রের লোকেরা না থাকলে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে শেষ করে ফেলতাম।

আমি তাদের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বললাম, আল্লাহর চেয়ে কি আমার গোত্রের লোকেরা বেশী শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান?! তোমরা আল্লাহকে ভয় না করে আমার গোত্রের লোকদের ভয় করছ। শোন, তোমাদের কাজকর্ম আর ষড়যন্ত্র সবই আল্লাহর হাতে। তিনি তা পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি চাইলে তা হবে। অন্যথায় নয়।

এরপরও আমি তাদের আল্লাহর আযাবের ভয় দেখিয়ে বললাম, দেখ, আমার সাথে বিরোধিতা করতে করতে তোমাদের উপর যেন নূহ আ. এর জাতি, হুদ আ. এর জাতি সালেহ আ. এর জাতি ও লুত আ. এর জাতির ন্যায় আযাব এসে না পড়ে। তাহলে তোমাদের রক্ষা করার কেউ থাকবে

না। সুতরাং সময় থাকতে তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তওবা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ দয়াময়। ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন।

তারপরও তারা আমার কোন কথাই শুনল না। আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে লাগল। আমার অনুসারীদের উপর নির্যাতন করতে লাগল। আমি তখন একেবারে নিরাশ হয়ে গেলাম। একদিন আমি তাদের বললাম, তোমাদের যা খুশী করতে থাক আর আমিও আমার কাজ চালিয়ে যাই। সত্বর জানতে পরাবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি কাদের ধ্বংস করে আর কে মিথ্যাবাদী? তোমরা অপেক্ষা কর। আমিও অপেক্ষা করছি।

এর কিছুদিন পর প্রতিশ্রুত দিবস এসে গেল। মাদইয়ান নগরীর উপর এক বিকট চিৎকার উত্থিত হল। চিৎকারের প্রচণ্ডতায় ঘরবাড়ি থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ধ্বসে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যেই কোলাহলময় নগরীর উপর কবরের নিরবতা নেমে এল। আল্লাহর অশেষ করুণায় বেঁচে রইলাম আমি ও আমার অনুসারীরা।

এ কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্ করে অশ্রু পড়তে লাগল। তিনি রোরুদ্ধকণ্ঠে বললেন, হে আমার জাতি! আমি তোমাদের নিকট আমার রবের পয়গাম যথাযথ পৌঁছিয়েছি। তোমাদের বহু উপদেশ দিয়েছি। সুতরাং এখন আর দুঃখ করার কিছুই নেই। অশ্রু মুছতে মুছতে শুয়াইব আ. তাঁর সাথীদের নিয়ে রওয়ানা হলেন। ঘন বনবাসীদের মাঝে এবার হিদায়তের কাজ করতে হবে। আল্লাহর পয়গাম এবার তাদের নিকট পৌঁছাতে হবে।

শুয়াইব আ. এর নেতৃত্বে ছোট্ট কাফেলাটি ঘন বনবাসীদের উদ্দেশে যাচ্ছে। ছোট একটি কাফেলা। নূরের কাফেলা। হিদায়াতের কাফেলা। নূর আর হিদায়াত নিয়ে তারা আল্লাহর নির্দেশে ঘন বনবাসীদের নিকট যাচ্ছে।

দাউস বৃক্ষ। হাজার হাজার উঁচু উঁচু দাউস ছাড়াও নানা ধরনের অনেক বৃক্ষের সমাহার। চারদিক সবুজ আর শ্যামলিমায় ভরা। গাছপালা আর তরুলতার ছড়াছড়ি। গা জুড়ানো শীতল বায়ুর প্রচুর আনাগোনা। বিচিত্র পাখির মোহময় কলতানে মতোয়ারা। লোহিত সাগরের তীরে গড়ে উঠা এ বনের পরিবেশ ভারি চমৎকার। গহীন গ্রাম্য পরিবেশ।

এ বনের মাঝে ঘরবাড়ি তৈরী করে বহু লোক থাকে। আল্লাহর দেয়া অপার নেয়ামত তারা বিনাপরিশ্রমে ভোগ করে। এদের গ্রামীণ জীবন ভারি চমৎকার। মিশর আর শামের সাথে যে তাদের কোন সম্পর্ক নেই তাও নয়। এরাও মাঝে মাঝে তাদের গ্রামীণ পণ্যসামগ্রী নিয়ে মিশর আর শামের বাজারে যায়। পসরা খুলে বসে।

শুয়াইব আ. তাদের মাঝে এসে উপস্থিত হলেন। তাওহীদের শিক্ষা ভুলে তারা শিরকে নিমজ্জিত হয়ে আছে। চারিত্রিক অধঃপতনের একেবারে শেষ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। এরাও মেপে দেয়ার সময় কম দেয়। কিন্তু মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় মেপে নেয়। এদের কেউ আবার দস্যু প্রকৃতিতে মেতে উঠেছে।

তিনি তাদের বুঝালেন। হৃদয় দিয়ে বুঝালেন। নবুয়তের দরদ মেখে বুঝালেন। বললেন, ভাইয়েরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমি একজন বিশ্বস্ত রাসূল। আমার অনুসরণ কর। শোন, আমি যে তোমাদের নিকট হিদায়াতের বাণী পৌঁছে দিচ্ছি তার বিনিময় কিন্তু আমি চাই না। আমাকে এর বিনিময় দিবেন আমার রব। নিখিল বিশ্বচরাচরের মালিক আল্লাহ। তোমরা মানুষকে মাপে কম দিয়ো না।

কিন্তু না, বনবাসীরা তাঁর কথা মেনে নিল না। তাঁর কথা শুনল না। উল্টো তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠল। যা তা বলতে শুরু করল। তাঁর সাথে তর্ক জুড়ে দিল। তর্কের এক পর্যায়ে একদিন তারা বলল, তুমি তো যাদুগ্রস্ত এক বদ্ধপাগল। তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ। সুতরাং তুমি কিভাবে আল্লাহর রাসূল হবে? আল্লাহর বার্তাবহক হবে?! নিশ্চয়ই তুমি একজন মিথ্যাবাদী।

তাদের এতো কথা, এতো তিরস্কার সবই তিনি নিরবে সহ্য করলেন। নিরাশ হলেন না। আশায় বুক বেঁধে গ্রাম্য এই মানুষগুলোর হাত ধরে ধরে বুঝাতে লাগলেন। কিন্তু না, কিছুই হল না। যেন অরণ্যে রোদন। তারা তাঁর কোন কথাই শুনল না।

একদিন শুয়াইব আ. নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে আল্লাহর কথা, তাওহীদের কথা ও পরকালের কথা বুঝাচ্ছিলেন। তখন তাদের মধ্য থেকে এক গোঁড়া প্রকৃতির লোক চ্যালেঞ্জ করে বলল, হে শুয়াইব! তুমি যদি সত্যই নবী হয়ে

থাক, তাহলে এখনই আমাদের উপর এক খণ্ড আকাশ ফেলে দাও। পারবে তা করতে?

শুয়াইব আ. বললেন, তোমরা যা বলছ আমার রব সে ব্যাপারে সমধিক অবহিত। তিনি সব কিছু দেখেন। সব কিছু শুনেন। তাই তোমরা অমন কথা বলো না। আমাকে বিশ্বাস কর। আমার কথা মেনে নাও।

দিনের পর রাত এল। রাতের পর দিন এল। কালের বিবর্তনের ধারায় মৌসুমের পরিবর্তন এল। কিন্তু ঘন বনবাসীদের মাঝে কোন পরিবর্তন দেখা দিল না। এরা যেন বনের বাদুর। অন্ধকারেই এদের জীবন। অন্ধকারেই এদের মরণ। এরা আলোর মেলা সহ্য করতে পারে না। হিদায়াতের বাণী শুনতে পারে না।

অবশেষে ঘনিয়ে এল এদের প্রলয় মুহূর্ত। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের এক দমকা উষ্ণ বায়ু প্রেরণ করলেন। তা তাদের পরিবেষ্টিত করে ফেলল। চারদিকে উত্তাপ আর উত্তাপ। অসহ্য অসনীয় উত্তাপ। উত্তাপে উত্তাপে তারা সিদ্ধ হয়ে গেল। ঘরবাড়ি উত্তপ্ত। পুকুর আর ঝরনার পানি উত্তপ্ত। চারদিকে যেন আগুনের হলকা। দিকবিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে তারা উন্মুক্ত খোলা মাঠে, বালুকাময় প্রান্তরে ছুটে পালাল। কিন্তু না সেখানেও রক্ষে নেই। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে মাথার মগজ টগবগ করতে লাগল। উত্তপ্ত পাথর আর ফুটন্ত বালির ছোঁয়ায় পায়ের গোশত খসে খসে পড়তে লাগল।

এমনি কঠিন শাস্তির মাঝে যখন তারা দিশেহারা দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য, ঠিক তখন দিগন্ত জুড়ে এক মেঘমালা দেখা দিল। শান্তির ক্ষীণ আশা তাদের হৃদয়ে উঁকি দিল। মেঘমালাটি তাদের দিকেই ছুটে আসছে আর মেঘমালা থেকে যেন শীতল বায়ুর ঝাঁপটা ছড়িয়ে পড়ছে।

শত আশায় বুক বেঁধে তারা মেঘমালার দিকে ছুটে গেল। বৃষ্টি বৃষ্টি বলে চিৎকার করতে লাগল। সবাই এসে মেঘমালার নিচে জড় হল। পিয়াসায় বুক ফেটে যায় যায়। বৃষ্টির আশায় বার বার উপরের দিকে তাকায়। কিন্তু না বৃষ্টির কোন আলামত দেখা যাচ্ছে না। ঠিক তখনই মেঘের আড়াল থেকে কুন্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে তাদের উপর অগ্নি বর্ষিত হতে লাগল। সে কী ভয়াবহ অগ্নি! সে অগ্নিতে জ্বলে পুড়ে তারা ছাই হয়ে গেল। পৃথিবীর বুকে তাদের আর কোন নিদর্শন রইল না। কোন চিহ্ন থাকল না।

দুই দুইটি লোকালয় শুয়াইব আ. এর চোখের সামনে আল্লাহর আযাবে নিঃশেষ হয়ে গেল। তিনি তাদের রক্ষা করার জন্য বহু চেষ্টা করেছেন। বহু মেহনত করেছেন। হাড়ভাঙ্গা কষ্ট করেছেন। কিন্তু না, তিনি তাদের রক্ষা করতে পারলেন না। তাই তাঁর মন ভীষণ ভারাক্রান্ত। হৃদয় অত্যন্ত বেদনাবিধূর। হেজাজে তাঁর মন আর টিকছে না। তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। সঙ্গী মুসলমানদের নিয়ে লোহিত সাগরের কূল ঘেষে যে পথটি ইয়ামেনের দিকে চলে গেছে সে পথ ধরেই ইয়ামেনে চলে এলেন।

ইয়ামেনের বিশাল এলাকা হাযরামউত। বিশ্ব জুড়ে তার খ্যাতি। এখানেই তিনি ইনতেকাল করেন। শিউন হাযরামউতের এক প্রখ্যাত শহর। এ শহরের পশ্চিমে একটি জায়গার নাম শাবাম। সেখানে গিয়ে ওয়াদিয়ে ইবনে আলীর পথ ধরে উত্তর দিকে কিছুটা গমন করলেই হযরত শুয়াইব আ. এর মাযার দেখতে পাওয়া যায়।

আজো হাজার হাজার মানুষ সেখানে যায়। অসংখ্য পর্যটক সেখানে ভিড় করে। সকাল-বিকাল সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর মাযার যিয়ারত করে। আল্লাহর নিকট দু'আ করে। মনোবাঞ্ছনা পূরণের প্রার্থনা করে। তারপর প্রশান্ত হৃদয়ে ফিরে আসে। কুরআন শরীফের ছাব্বিশতম পারার সূরা-ক্বাফ এবং তেইশতম পারার ছোয়াদে তার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

কারো কারো মনে হযরত শুয়াইব আ. সিরিয়ার করন হাত্তীন নামক স্থানে ইনতেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

আস্হাবুস সাবত্*

লোহিত সাগরের বুক জুড়ে তরঙ্গমালা আর তরঙ্গমালা। উচ্ছল উত্তাল তরঙ্গমালা। শুভ্র সফেদ ফেনার তাজ মাথায় ধারণ করে শোঁ শোঁ রব তুলে তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে। আছড়ে পড়ে উপকূলে। তারপর আবার সাগরের অথৈ জলরাশিতে মিশে আত্মলীন হয়ে যায়। এভাবে সেই কবে থেকে যে তরঙ্গমালা উপকূলে আছড়ে পড়ছে আর আত্মলীন হয়ে যাচ্ছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। কোন ইতিহাস নেই।

সকালে সূর্যের নব কিরণের ছোঁয়ায় গোটা সাগরের বুক জুড়ে এক বিস্ময়কর ঝিলিমিলি খেলা শুরু হয়। আর সন্ধ্যায় সূর্য যখন শৌর্যবীর্য ও প্রতাপ হারিয়ে ম্রিয়মাণ মুখে দিগন্তে পৌছে 'আল বিদা, আল বিদা' বলতে থাকে, তখন সাগরের বুকে রক্তিম রঙ্গের ছড়াছড়ির ফলে মন উতলা হয়ে উঠে। বৈচিত্র্যময় পাখিরা তখন আনন্দে কলরব করতে করতে ডানা মেলে উড়ে যায় নীড়ের সন্ধানে। প্রকৃতির এ মোহময় ধারা চলে আসছে আদিকাল থেকে। মহাপ্রলয়ের দিন পর্যন্ত তা চলতে থাকবে।

এ সাগরের তটে গড়ে উঠেছে এক বিরাট জনবসতি। নাম আইলা। হাজার হাজার ইহুদী তাতে বাস করে। জীবন জীবিকার সন্ধানে এরা নানা কাজ করলেও মাছ ধরা এদের আদি পেশা। কারো কারো নেশাও বটে।

* আসহাবুস সাব্ত : অর্থ শনিবারের অবাধ্য ব্যক্তিগণ। হযরত মূসা আ.-এর যুগে ইহুদীরা বেঁকে বসল। শুক্রবারের পরিবর্তে শনিবারকে ইবাদতের দিন ধার্য করতে হবে। আল্লাহ তা মেনে নিলেন এবং শনিবারের পবিত্রতা রক্ষায় দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিলেন। কিন্তু একদল ইহুদী তার পবিত্রতা রক্ষা করল না। তারা আল্লাহর গযবে নিপতিত হল। তাই তাদেরকে আসহাবুস সাব্ত বলা হয়।

পেশাজীবী আর নেশাজীবী এই ইহুদীরা প্রত্যুষে ছোট বড় নৌকায় চেপে রাজহাঁসের মত সাগরের বুকে ভেসে ভেসে অনন্তের মাঝে হারিয়ে যায়। তরঙ্গের তালে তালে মাছের সন্ধানে ছুটে বেড়ায়। সারাদিন ছুটাছুটি আর পরিশ্রমের পর যে মাছগুলো ধরতে পারে তা বিক্রয় করে খাদ্য সামগ্রী তৈরী করে।

সপ্তাহে ছ'দিন তাদের এ কাজ। শনিবার এলে তাদের সকল কাজ বন্ধ। ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, কৃষি বা অন্য যে কোন ধরনের কাজ বন্ধ। দুনিয়াবী কোন কাজ তারা করে না। সারাদিন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে কাটায়। যিকির আযকার করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেযামন্দির জন্য আত্মভোলা হয়ে যায়। এটা ইহুদীদের ধর্মীয় বিধান। এটা ইহুদীদের সংস্কৃতি ও কালচার।

অবশ্য ইতিহাসের এবড়ো-থেবড়ো আর সরল-বক্র পথ মাড়িয়ে আরো দেখা যায় ভিন্ন বিধান। যে বিধান হযরত ইবরাহীম আ. থেকে পর্যায়ক্রমে হযরত মূসা আ. পর্যন্ত চলে এসেছে। তা হল, শুক্রবারের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতার বিধান। ইবরাহীম আ. এর এ সুন্নতী বিধান পর্যায়ক্রমে সকল নবী ও তাঁদের উম্মতেরা পালন করেছেন। হযরত ইসহাক আ., হযরত ইয়াকুব আ., হযরত ইসমাইল আ., হযরত ইউসূফ আ. ও অন্যান্য সকল নবী এ বিধান পালন করেছেন। সপ্তাহে শুক্রবার ছিল তাঁদের ইবাদত বন্দেগীর দিন। এ দিন তাঁরা অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশী ইবাদত বন্দেগী করতেন। আল্লাহর যিকির আযকার করতেন। হযরত মূসা আ. এর যুগেও তাই ছিল। শুক্রবার ইবাদতের দিন হিসেবে সে দিনে মানুষ বেশী বেশী ইবাদত বন্দেগী করত। যিকির আযকার করত। আল্লাহর গুণ-কীর্তন করত।

কিন্তু ইহুদীদের রক্তের কণিকায় কণিকায় মিশে আছে অবাধ্যতা, গোঁড়ামী আর বখাটেপনা। নবীদের বিরোধিতা করা তাঁদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা, তাঁদের শানে অপবাদ বলে বেড়ানো, এমনকি তাদের হত্যা করাও তাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। তাই কিছু দিন যেতে না যেতেই তারা মূসা আ. এর সাথেও সেই গোঁড়ামী আর বখাটেপনা শুরু করল। নানা কাজে তাঁর হুকুম লঙ্ঘন করতে লাগল।

একদিন তারা হযরত মূসা আ. এর নিকট এসে বলল, আমরা শুক্রবারকে ইবাদতের দিন হিসেবে পালন করতে পারব না। এদিনে আমাদের অনেক ঝামেল। অনেক ব্যস্ততা। আল্লাহর কাছে বলে কয়ে শনিবারকে আমাদের জন্য ইবাদতের দিন হিসেবে নির্ধারিত করে দিন।

মূসা আ. তাদের কথা শুনে একবারে তাজ্জব হয়ে গেলেন। আরে! এরা বলে কি! আল্লাহর বিধানকে নিয়ে এ কী ছেলেখেলা! ইবরাহিমী সুন্নত পালনে এ কী অবহেলা! তিনি তাদের অনেক বুঝালেন। শুক্রবারের ফযীলত, মাহাত্ম্য ও তাৎপর্যের আলোচনা করলেন। সুন্নতে ইবরাহিমীকে আঁকড়ে ধরতে উৎসাহিত করলেন। উদ্বুদ্ধ করলেন। আরো অনেক কিছু বললেন। কিন্তু ইহুদীদের ঐ একই কথা। ঐ একই বক্তব্য। আমরা এতো কিছু বুঝতে চাই না। এতো কিছু শুনতে চাই না। আমরা যা বলছি আপনি তাই করুন।

একরোখা, একগুঁয়ে আর অবাধ্য ইহুদীদের নিয়ে মূসা আ. দারুণ বিপাকে পড়লেন। কী করবেন? কিভাবে বুঝাবেন? কোন কূল কিনারা পেলেন না। অবশেষে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন। বিনয় বিগলিত কণ্ঠে শুক্রবারের পরিবর্তে শনিবারকে ইবাদতের দিন ধার্য করার প্রার্থনা করলেন।

দয়াময় আল্লাহ। ইহুদীদের এ অন্যায় জিদের কারণে, এ একগুঁয়েমির কারণে ক্ষুব্ধ হলেও মূসা আ. এর প্রার্থনা কবুল করে নিলেন এবং শুক্রবারের পরিবর্তে শনিবারকেই ইবাদতের দিন ধার্য করলেন। তবে তার সাথে কিছু শর্তারোপও করলেন।

আল্লাহ তা'আলা কড়া নির্দেশ দিলেন, প্রার্থিত দিবসের মর্যাদা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এ দিবসের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি অবশ্যই কড়া নজর রাখতে হবে। ক্রয় বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, শিকার, কৃষিকাজ ইত্যাদি কোন ধরনের দুনিয়াবি কাজ করা যাবে না। এ দিনটিতে শুধুমাত্র ইবাদত বন্দেগী করে কাটাতে হবে।

এ নির্দেশ দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাইল থেকে অতি কঠিন ও দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। ব্যস, শনিবার হল ইহুদীদের ইবাদতের দিন। বন্দেগীর দিন। এ দিন এলে তারা দুনিয়াবী সকল কাজ ফেলে আল্লাহর ইবাদতের মশগুল হয়ে যায়। যিকির আযকারে মগ্ন হয়ে যায়।

এভাবে দীর্ঘকাল ইহুদীরা শনিবারের সম্মান প্রর্দশন করল। শনিবারের মর্যাদা রক্ষা করল। আল্লাহ যে কাজ শনিবারে হারাম করে দিয়েছেন তা থেকে বিরত রইল। দূরে রইল। ধীরে ধীরে এটাই হয়ে গেল ইহুদীদের কালচার ও সংস্কৃতি।

আইলা জনবসতির ইহুদীদের মাঝেও এ কালচার ও সংস্কৃতি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালিত হত। শনিবার এলে সবাই যার যার কাজ ফেলে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়। যিকির আযকারে মগ্ন হয়ে পড়ে। ব্যবসা-বানিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ক্ষেত-খামার, মাছ ধরা ইত্যাদি দুনিয়াবী সকল কাজ হারাম। তাই তারা এসব কাজ থেকে দূরে থাকে। শনিবারে এসব কিছুই করে না। লোহিত সাগরের বুকে তোলপাড় সৃষ্টি করে কেউ মাছ ধরতে যায় না। নৌকার আনাগোনা বন্ধ থাকে। তাই সে দিন মানুষের কোন উৎপাত মৎসকুলকে সহ্য করতে হয় না। নির্বিঘ্নে তারা চলাফেরা করে। পানির উপরে ভেসে তীর ধরে ছুটতে থাকে। একবারে হাতের নাগালে চলে আসে। ইচ্ছে করলে যে কেউ হাত দিয়েই ধরতে পারে।

শনিবার চলে গেলে এ সব মাছের আর কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। একেবারে লাপাত্তা হয়ে যায়। সাগরের অথৈ গভীরে গিয়ে আত্মগোপন করে। কেউ তাদের খুঁজে পায় না। আবার শনিবার এলে তোলপাড় করে সমুদ্রের বুকে উৎসব করে। আর ইহুদীরা উপকূলে দাঁড়িয়ে লোভনীয় চোখ মেলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ইচ্ছে করলেই ধরতে পারে। কিন্তু ধরতে সাহস পায় না। মানসপটে ভেসে উঠে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা। মনে পড়ে আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা।

এভাবে বেশীদিন যেতে পারল না। এগিয়ে এল শয়তান। একেবারে বুযুর্গের আকৃতি ধরে এল। হাঁ করে তাকিয়ে থাকা ইহুদীদের নিকট এসে বলল, তোমরা এভাবে হাঁ করে দাঁড়িয়ে কেন? আজ শনিবার ইবাদত বন্দেগীতে কেন মনোনিবেশ করছ না? ইহুদীরা বলল, হুজুর! মাফ করবেন। মাছগুলো দেখে লোভ আর সামলাতে পারছি না। কি করব তা ভেবেও পাচ্ছি না। আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করারও সাহস নেই।

শয়তানের অধরে কুটিল হাসি। বলল, তোমরা দেখছি ইবাদত বন্দেগীর কথা ভুলে মাছ ধরার চিন্তায় ডুবে আছ। এতো মহাপাপ। ভারী অন্যায়।

তবে তোমাদের একটি বুদ্ধি দেব। এতে তোমাদের উভয়ই হাসিল হবে। মাছও পাবে। আবার ইবাদতও হবে।

ইহুদীদের চোখের তারা চিকচিক করে উঠল। জানার আগ্রহ উপচে পড়ল তাদের চোখেমুখে। শশব্যস্তে বলল, হুজুর! আমরা তো এমন একটি বুদ্ধির অপেক্ষায় আছি। দয়া করে আমাদের তা বলে দিন। আমরা আপনার প্রতি চির কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।

শয়তান দেখল, লোভী ইহুদীরা তার টোপ ভালভাবেই গিলেছে। আর দেরি করা যায় না। বলল, এক কাজ কর, শুক্রবারে তো আর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তাই শুক্রবারে সন্ধায় আবছা অন্ধকারে সাগরের তীরে বড় বড় গর্ত করে সাগর হতে নালা কেটে গর্তগুলোর সাথে যুক্ত করে দিবে। তবে তার মুখ বন্ধ করে রাখবে। শনিবার দিন মাছেরা যখন গর্তের মুখের দিকে আসবে তখন মুখ খুলে দিবে। ফলে স্রোতের প্রবাহে মাছগুলো গর্তে চলে আসবে। তারপর গর্তের মুখ বন্ধ করে চলে আসবে। আর রবিবারে তা ধরবে। অথবা শক্রবারে উপকূলে জাল, বড়শী ফেলে রাখবে। শনিবারে মাছ এসে তাতে আটকে থাকবে আর রবিবারে তা ধরবে।

শয়তানের বুদ্ধিতে ইহুদীদের মনে আনন্দের দোলা লাগল। অবলীলায় তাদের মাথায় দুলে উঠল। বলল, ভারী চমৎকার বুদ্ধি তো! তাই করতে হবে। মাছও ধরা হবে আবার ইবদতও করা হবে। কেউ অবাধে পাপীও বলতে পারবে না।

পরের শনিবারে তাই ঘটল। ইহুদীদের গর্তে বহু মাছ এসে আবদ্ধ হল। জালে আর বড়শীতেও অনেক মাছ আটকা পড়ল। আর রবিবার সকালে এসে তারা মহোৎসবে তা ধরল। কয়েক শনিবার ঘুরতে না ঘুরতেই বহু ইহুদী একাজে অংশ নিল।

একদল পরহেযগার মুত্তাকী লোকেরা এ অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে উঠল। চিন্তিত ও বিমর্ষ হল। আল্লাহর আযাবের ভয়ে তাঁদের হৃদয় কেঁপে উঠল। তাঁরা এ নাফরমানী করতে বারণ করল।

মৎস শিকারীরা তাঁদের কথার কোন তোয়াক্কা করল না। তাদের কোন পাত্তাই দিল না। চরম ঔদ্ধত্যের সাথে বলল, ধর্ম নিয়ে আপনারা খুব

বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছেন। কিছুতেই এটা ঠিক নয়। আল্লাহ আমাদের শনিবারে মাছ ধরতে নিষেধ করেছেন। আমরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি। শনিবারে আমরা মাছ ধরি না। রোববারে ধরি। এতে আমাদের কী অপরাধ হল!

বাক চাতুর্যে তারা পরহেযগার মুত্তাকী লোকদের পরাজিত করে দিল। একেবারে লা-জওয়াব করে দিল। কিন্তু অন্তরের বুঝাপড়ায় তারা পরাজিত। এ গর্হিত কাজের জন্য অন্তর তাদের সর্বদা তিরস্কার করল। ভৎর্সনা করল। কিন্তু তারা ফিরে এল না। লোভের অগ্রাসী হামলার সামনে তাদের অন্তরের অপমৃত্যু ঘটল। লোভ তার বিজয় কেতন নিয়ে বীর দর্পে সামনে এগিয়ে বলল।

সময়ের তালে তালে শিকারীর সংখ্যা বেড়েই চলল। তাছাড়া তাদের ঔদ্ধত্যও চরমে পৌঁছল। একেবারে বেপরোয়া হয়ে গেল। আল্লাহর ভয় তাদের অন্তর থেকে মুছে গেল। আল্লাহর বিধানের কোন মর্যাদা তাদের অন্তরে রইল না। আরো কিছুদিন পরে দেখা গেল, কিছু লোক শনিবারেও মাছ ধরতে শুরু করেছে।

নেককার পরহেযগার লোকেরা তাদের বারবার বুঝাতে লাগল। সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বারণ করতে লাগল।

আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাল। শনিবারের পবিত্রতা রক্ষার জন্য উৎসাহিত করল। কিন্তু কোনই ফলোদয় হল না। একবারে অরণ্যে রোদন। ইহুদীরা যেই সেই। তাদের মাঝে কোন পরিবর্তন এল না।

নেককার লোকেরা এবার দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল হতাশাক্রান্ত। তারা মৎসশিকারীদের ব্যাপারে একেবারে নিরাশ হয়ে গেল। তাঁরা তাদের উপদেশ দেয়া বন্ধ করে দিল। তাদের সাথে কথাবার্তাও বন্ধ করে দিল। শুধু তাই নয়। যারা হতাশাক্রান্ত হয়নি, এখনো হেদায়াতের আশা করছে তাদের ডেকে বলল, বন্ধুরা! এ নাফরমানদের, এ পাপীদের উপদেশ দিয়ে, নসীহত করে কোন লাভ নেই। একেবারে নিষ্ফল। ব্যর্থ প্রয়াস। এরা পাপ কাজকে পাপ কাজ মনে করছে না। খোঁড়া যুক্তি দিয়ে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনে মেতে উঠেছে। ছলনার আওতায় ফেলে পাপ কাজকে নেক কাজের আবরণে পেশ করছে। তাই এরা কখনো তওবা করবে না। কৃতকর্মের

কারণে অনুশোচনায় জর্জরিত হবে না। আমাদের বিশ্বাস, সত্বর এদের উপর আল্লাহর আযাব ও গযব নেমে আসবে। এরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কঠিন আযাবে নিপতিত হবে। তাই এদের এখন আর কিছু বলে লাভ নেই।

আশাবাদী লোকেরা বলল, তাদের অবস্থা যাই হোক, আমরা উপদেশ দানে বিরত হব না। উপদেশ দিতেই থাকব। তাহলে আমরা কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট ওজর পেশ করতে পারব। বলতে পারব, ইয়া আল্লাহ! আমরা শেষ পর্যন্ত তাদের উপদেশ দিয়েছি। সৎকাজের আদেশ করেছি, অসৎ কাজে বারণ করেছি। আমরা আমাদের কর্তব্য যথাযথ পালন করেছি। আমরা এখনো নিরাশ হয়ে যাইনি। আশাহত হইনি। হয়তো এখনো তারা তওবা করে পাপ কাজ থেকে ফিরে আসতে পারে।

এর পরও বেশ কিছুদিন কেটে গেল। সকাল-সন্ধ্যার আবর্তনে ছোট খাট অনেক কিছুই ঘটল। কিন্তু অবাধ্য ইহুদীদের চিন্তার জগতে কোন পরিবর্তন দেখা দিল না। অনুশোচনায় তাদের মন কেঁপে উঠল না। আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে মাছ ধরা থেকে বিরত হল না। শনিবরের সম্মান ও মর্যাদার অনুভূতির শেষ চিহ্নটুকুও তাদের হৃদয় থেকে মুছে গেল। তারা এখন অত্যন্ত বেপরোয়া, উদ্ধত, নির্ভীক। হৃদয় তাদের পাষাণ হয়ে গেছে। কোন কিছুই শুনতে চায় না। কোন কিছুই মানতে চায় না।

পরহেযগার লোকেরা এবার অন্য চিন্তা করল। তাদের সামাজিক ভাবে বয়কট করে প্রতিহত করতে চাইল। তাদের সাথে সর্বপ্রকার মেলামেশা বন্ধ করে দিল। পানাহার, ক্রয়-বিক্রয়, আদান-প্রদান ইত্যাকার সকল সামাজিক আচার ব্যবহার বন্ধ করে দিল। শুধু তাই নয়। অবাধ্য ইহুদীদের ঘরবাড়ি অভিমুখী তাদের ঘরবাড়ির দরজগুলোও বন্ধ করে দিল।

সামাজিক এ বয়কটও তীব্র আকার ধারণ করল। অবাধ্য ইহুদীদের সাথে পরহেযগার লোকদের সাথে কোন সম্পর্ক বাকি রইল না। কিন্তু তবুও তাদের কোন বোধোদয় হল না। চেতনা ফিরে এল না। পাপ করতে করতে তাদের হৃদয় পাপাসক্ত হয়ে গেছে। ঔদ্ধত্য আর অহঙ্কারে তারা আযাযীলকেও ছাড়িয়ে গেছে। হিদায়াতের সকল যোগ্যতা তাদের শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহর রহমতের তারা অযোগ্য হয়ে গেছে। ফলে ঘনিয়ে

এল প্রতিশ্রুতি সময়। একরাতে তাদের উপর আল্লাহর গযব নিপতিত হল।

পরদিন সকালের ঘটনা। প্রত্যূষে পরহেযগার লোকেরা যথারীতি বিছানা ত্যাগ করে ইবাদত বন্দেগী করল। খাবার দাবারের পর সাংসারিক কাজে লিপ্ত হল। বাজারে গেল। দোকানে গেল। অনেকের সাথে দেখা হল। কথাবার্তা হল। বেলা উঠেছে সেই অনেক আগে। কিন্তু কেউ অবাধ্য ইহুদীদের কাউকে কোথাও দেখতে পেল না। আইলা জনবসতি যেন অবাধ্য ইহুদী-শূন্য হয়ে গেছে। হঠাৎ করে তাদেরকে দেখা যাচ্ছে না। তাদের ছেলে সন্তানদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কী খবর! ঘটল কী!

তাদের ঘরবাড়ির খবর নিল, কেউ কেউ গিয়ে দেখেও আসল। না তাতেও কোন প্রাণ চাঞ্চল্য নেই। সব নিরব নিথর হয়ে পড়ে আছে। যেন মৃত্যুপুরী। যেন মায়ার দেশ।

সবার চোখে মুখে ওষ্ঠাধরে জিজ্ঞাসুভাব ফুঠল। একটা অনুসন্ধিৎসুভাব সবাইকে অস্থির করে তুলল। কী হল! সকাল থেকেই কাউকে যে দেখা যাচ্ছে না। তা হলে কি আল্লাহর গযব এসে গেছে! ভাবতেই মনটা ছ্যাৎ করে উঠল। শরীর শিউড়ে উঠল। অবাধ্য ইহুদীদের বাড়িঘরে গিয়ে দেখল, সব খাঁ খাঁ করছে। বাড়িঘর অর্গলবন্ধ। কেউ এখনো বেরোয়নি। অর্গল ভেঙে প্রবেশ করতেই তাদের চক্ষু ছানাবড়া। এ কী! তারা এ সব কী দেখছে! চোখ দেখছে কিন্তু মন যে বিশ্বাস করতে চাইছে না। বয়েসী মানুষগুলো শুকর হয়ে গেছে আর যুবকরা বানর হয়ে গেছে। যে যেখানে আছে ঝিম ধরে পড়ে আছে। নড়াচড়ার শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে। ঝরঝর করে অঝোর ধারায় তাদের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

পরহেযগার লোকদের দেখে তারা এগিয়ে এল। একান্ত পরিচিত মানুষের মতই পাশে এসে দাঁড়াল। অনুশোচনায় তারা একেবারে ভেঙে পড়েছে। একেবারে এতটুকুন হয়ে গেছে। মুখে বাকশক্তি নেই। দুঃখ-বেদনা প্রকাশের ভাষা নেই। অশ্রুর ধারাই তাদের মনের অবস্থা বর্ণনা করছে।

আত্মীয়স্বজন আর পরিচিতজনদের দেখে তাদের পায়ে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল। ইশারা ইঙ্গিতে নিজেদের দুর্দশার কথা ব্যক্ত করল। দু'আ প্রার্থনা করতে লাগল।

পরহেযগার লোকেরা বিজড়িত কণ্ঠে বলল, আমরা কি তোমাদের আযাবের ভয় দেখাতাম না?

শুকর আর বানর আকৃতির মানুষগুলো মাথা নেড়ে সম্মতি জ্ঞাপন করল। ইঙ্গিতে দু'আ চাইল। ক্ষমা চাইল। কুরআন শরীফের নবম পারার সূরা আ'রাফ আসহাবে সাবতের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অনুশোচনায় মরে যাওয়া এ মানুষগুলোর কান্না আর থামল না। জীবন তাদের স্তব্ধ হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়া তাদের বন্ধ হয়ে গেছে। প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল। কিন্তু কান্না আর থামল না। অশ্রু আর বন্ধ হল না। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল সেখানেই কাঁদতে থাকল। আক্ষেপ আর অনুশোচনা তাদের দগ্ধ করে ফেলল। এভাবে তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

আস্‌হাবুল কাহ্‌ফ*

হযরত ঈসা আ. উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী-রাসূলদের অন্যতম রাসূল। বনী ইসরাইলের মাঝে প্রেরিত সর্বশেষ রাসূল। পৃথিবীর বুকে প্রেরিত সর্বশেষ

* আস্‌হাবুল কাহ্‌ফ : অর্থ গুহার অধিবাসীগণ। এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে স্মার্মানার ৪০/৫০ মাইল দক্ষিণে একটি ঐতিহাসিক গুহা বিদ্যমান। মূর্তিপূজক সম্রাট দাকিয়ানূসের রাজত্বকালে (১৫১-২৪৯) তার নির্যাতন নিপীড়নের ভয়ে তাওহীদে বিশ্বাসী কয়েকজন যুবক এক গুহায় আত্মগোপন করে ঘুমিয়ে পড়েছিল এবং সম্রাট বাইদূসীসের (দ্বিতীয় থিউডোসিয়স) রাজত্বকালে (৪০৮-৪০৫) তারা জাগ্রত হয়েছিল। উক্ত গুহার অধিবাসী এ যুবকদেরকে আস্‌হাবুল কাহফ বলা হয়।

আসহাবে কাহফের নামের বরকত

আরবী ভাষায় আসহাবে কাহফের নাম

مَكْسَلمِيْنَا- يَمْلِيْخَا- مَرْطُوْنُسْ- سَنُوْنُسْ- سَارِيْنُوْنُسْ- ذُوْنُوَاسْ-كَعَسْطَطَيُوْنُسْ

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে এ নামসমূহের অনেক উপকারিতার কথা বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল।

১. কোথাও আগুন লেগে গেলে এ নামসমূহ একটি কাগজে লিখে আগুনে ফেললে আগুন নিভে যায়।

২. কোন শিশু বেশী কান্নাকাটি করলে এ নামসমূহ লিখে তার মাথার নিচে রেখে দিলে তার কান্না থেমে যায়।

৩. ক্ষেতের ফসলের হিফাজতের জন্য এ নামসমূহের তাবিজ লিখে ক্ষেতে মাঝে কোন কাঠে বা বাঁশে বেঁধে দিলে ফসল নিরাপদ থাকে।

৪. তৃতীয় দিনেও কারো জ্বর না ছাড়লে এ নামসমূহের তাবিজ লিখে বাহুতে বেঁধে দিলে জ্বর ভালো হয়ে যায়।

৫. কোন মোকদ্দমায় ফয়সালার জন্য যাওয়ার সময় ডান উরুতে এ নামসমূহের তাবিজ বেঁধে গেলে ইনশাআল্লাহ বিচারকের মন নরম হয়।

৬. ধন-সম্পদ ও সাওয়ারীর হিফাজতের জন্য এ নামসমূহের তাবিজ বিশেষ উপকারী।

৭. নদীপথে সফরের সময় বিপদ হতে নিরাপদে থাকার জন্য এ নামসমূহের তাবিজ বিশেষ উপকারী।

৮. শত্রুর হাত হতে নিরাপদ থাকার জন্য এ নামসমূহের তাবিজ সঙ্গে রাখলে বিশেষ উপকার হয়।

৯. কোন সন্তান পালিয়ে গেলে এ নামসমূহের তাবিজ সূতায় বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিলে ইনশাআল্লাহ তৃতীয় দিনে সন্তান ফিরে আসে।

ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদাতা রাসূল।

হযরত মূসা আ. পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন সে অ-নে-ক দিন আগে। ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। বনী ইসরাইলের মাঝে নানা কুসংস্কার আর গোমরাহী ছড়িয়ে পড়েছে। তাওরাতের বিধি-বিধানের কথা ভুলে গেছো, চারদিকে ভ্রষ্টতা আর গোমরাহীর গাঢ় অন্ধকার। হিদায়াত আর নূরের আলোর দারুণ অভাব। তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা আ. কে প্রেরণ করলেন।

মায়ের কোলে যখন তিনি নবজাতক তখনই নবুওয়তের দাবী করলেন। বড় হলে আল্লাহ তাঁর উপর ইঞ্জিল অবতীর্ণ করলেন। তিনি বনী ইসরাঈলকে হিদায়াতের দিকে, সত্যের দিকে, আলোর দিকে আহ্বান করতে থাকলেন।

কিন্তু না, ইহুদীরা তাঁর কথা মানল না। তাঁর কথা কানেও তুলল না। তারা তাঁর বিরুদ্ধাচারণ শুরু করল। পদে পদে তাঁকে বাধা দিতে লাগল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কয়েকটি মোজেযা দান লাগলেন।

নরম মাটি হাতে নিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করেন। তারপর আল্লাহর নাম নিয়ে ফুৎকার দেন। আর অমনি তা জীবন্ত পাখি হয়ে উড়ে চলে যায়।

জন্মান্ধ। দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার যার বিন্দুমাত্রও আশা নেই। তাঁর চোখে হাত বুলিয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে ফুঁ দিয়ে দিলেই সাথে সাথে সে ভাল হয়ে যায়।

জরাজীর্ণ কবর। বহুকাল আগে তাতে দাফন করা হয়েছে কাউকে। সে কবরের পাশে গিয়ে তিনি দাঁড়ান। বলেন, "কুম বিইযনিল্লাহ" হে শায়িত ব্যক্তি! আল্লাহর অনুমতিতে উঠে দাঁড়া। ব্যস....সাথে সাথে কবরের মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে সেই মৃত ব্যক্তি।

ইহুদীরা ঈসা আ. এর এসব মোযেজা দেখল। বিস্মত হল। কিন্তু তাঁকে রাসূল বলে মেনে নিল না। তারা বলল, তুমি মস্তবড় যাদুকর। তুমি মিথ্যাবাদী। যাদুকর হয়ে নিজেকে নবী বলে দাবী করছ। তুমি প্রতারক।

তুমি ভণ্ড।

এখানেই শেষ নয়। তারা তাঁকে পদে পদে বাধা দিতে লাগল। তাঁর বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা শুরু করল। তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করার পাঁয়তারা করল। তখন আল্লাহ তা'আলা ঈসা আ. কে সশরীরে জীবিত অবস্থায় আকাশে তুলে নিলেন।

এবার নির্যাতন শুরু হল ঈসা আ. এর ভক্ত, অনুরক্ত আর অনুসারীদের উপর। অমানুষিক নির্যাতন। অসহনীয় নির্যাতন। যে যে দিকে পারল ছিটকে পড়ল। পালিয়ে জীবন বাঁচাল। তারপর গোপনে অত্যন্ত সন্তর্পণে খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করতে লাগল। নানা ঘাত প্রতিঘাত ও প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হয়েও তারা তা ত্যাগ করল না। ফলে এখানে সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা ধীরে ধীরে ঈসা আ. আনিত খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল।

২৫০ খৃষ্টাব্দের কথা। দাক্ইয়ানুস তখন রোমের সম্রাট। অত্যন্ত প্রভাব ও প্রতাপশালী সম্রাট। সবাই তার ভয়ে থর থর করে কাঁপে। তার নামেই প্রতিপক্ষের পিলে চমকে উঠে। বাঁচাও বাঁচাও করে পালায়।

প্রতিমা। হ্যাঁ, মানুষের হাতে গড়া প্রতিমার সাথেই সম্রাট দাক্ইয়ানুসের হৃদয়ের সম্পর্ক। প্রতিমার জন্য তার মন পাগল। সকাল-সন্ধা প্রতিমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। পূজা অর্চনায় বিভোর থাকে। শত ব্যস্ততার মাঝেও সকাল-সন্ধ্যা মন্দিরে উপস্থিত হয়। বেদীর সামনে নতজানু হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সুরভী মিশিয়ে প্রতিমার গুণকীর্তন করে।

একদিন সম্রাট দাক্ইয়ানুসের কানে সংবাদ পৌল, গোটা রোম সাম্রাজ্য জুড়ে এক নতুন ধর্মের প্রচার চলছে। দিনে দিনে তার অনুসারীর দল বেড়েই চলছে। প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে তারা কথা বলে। নিরাকার এক আল্লাহকে রব হিসাবে মানে। তাঁরই ইবাদত বন্দেগী করে।

সংবাদ শুনে সম্রাট হুঙ্কার দিয়ে উঠল। কী এতো বড় আস্পর্ধা! আমার সাম্রাজ্যে বাস করে আমার বিরুদ্ধাচারণ? প্রতিমার বিরুদ্ধে কথাবার্তা? অসহ্য অসহ্য!!

সাথে সাথে সম্রাট খৃষ্টান নিধনে বেরিয়ে পড়ল। সাথে তার বিশাল বাহিনী। শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম চষে বেড়াতে লাগল। যাকেই খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী পেল ধরে হিড় হিড় করে টেনে আনল। তারপর প্রতিমা পূজায় বাধ্য করল। কেউ অস্বীকার করলেই নেমে এল তার উপর অমানুষিক নির্যাতন আর নিপীড়ন। তিলে তিলে তাকে হত্যা করে তবেই শান্ত হত সম্রাট দাক্ইয়ানুসের হৃদয়।

আফসুস। এশিয়া মহাদেশের একেবারে পশ্চিমে ইজিয়ান সাগরের উপকূলে অবস্থিত রোমানদের এক বিরাট শহর। বর্তমানে তুরস্কের ইজমীর (স্মার্না) শহর থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দক্ষিণে তার ধ্বংসস্তূপ রয়েছে। সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত রোমানদের এটাই ছিল সর্ববৃহৎ নগরী। রাজধানী তুরতূস থেকে বেশ কিছুটা দূরেই তার অবস্থান। নিরবে, নিশ্চিন্তে, নির্ঝঞ্ঝাটে নগরবাসীদের জীবন কেটে যাচ্ছে। হঠাৎ একদিন সেই নগরীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হল সম্রাট দাকইয়ানূস। সাথে তার বিশাল বাহিনী। সম্রাটের সসৈন্য উপস্থিতিতে নগরবাসীর অন্তরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। আগাম ঝড়ের পূর্বাভাসে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। এরই মাঝে সেই ঝড়ের তান্ডব শুরু হয়ে গেল। খুঁজে খুঁজে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের ধরে সম্রাট দাক্ইয়ানুসের নিকট নিয়ে এল তার বাহিনী।

যাদের ঈমান দুর্বল, যারা ইহলোকের মায়া ত্যাগ করতে পারল না, যারা আখেরাতের তুলনায় দুনিয়াকেই প্রাধান্য দিল তারা সম্রাটের শাস্তির ভয়ে খৃষ্ট ধর্ম ত্যাগ করল এবং প্রতিমা পূজা শুরু করল। আর যারা খৃষ্ট ধর্মে অটল অবিচল রইল, তাদের উপর নেমে এল মর্মন্তুদ শাস্তি। তিলে তিলে তাদের হত্যা করে তাদের লাশ নগর প্রাচীরের ফটকে লটকে দেয়া হল।

সেই নগরীতে সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর সাত ধার্মিক সৎ যুবক ছিল। তাদের কারো আবার রাজ পরিবারের সাথেও সম্পর্ক। নাম মুকসালমীনা, তামলীখা, মারতূনুস, সানূনুস, সারীনূতুস, যূনাওয়াস ও কা'আসতাতিয়ূনুস। শৈশব কাল থেকেই তারা বুদ্ধিমত্তায় অদ্বিতীয়। আচার-আচরণে অতুলনীয়। তারাও প্রকৃত ও অবিকৃত খৃষ্ট ধর্মের অনুসারী। সম্রাট দাকইয়ানূসের এ তাণ্ডব দেখে তারা অত্যন্ত মর্মাহত হল।

দারুণ দুঃখ ভারাক্রান্ত হল। কিন্তু সম্রাটের বিরুদ্ধে কিছুই করার শক্তি যে তাদের নেই। তবে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ পেশ করার পথ তাদের খোলা। এ পথেই তারা অগ্রসর হল। একটি নির্জন স্থানে একত্রিত হয়ে আল্লাহর ইবাদত শুরু করল। কেঁদে কেঁদে দু'আ করতে লাগল– হে আল্লাহ! হে আসমান ও জমিনের রব! আপনিই আমাদের রব। আপনিই আমাদের পালনকর্তা। আমরা কিছুতেই আপনাকে ছাড়া কারো ইবাদত করব না। আপনি আমাদের এ ফিতনা থেকে মুক্তি দিন। আমাদের এ বিপদ দূর করে দিন।

সম্রাট দাকইয়ানূসের বাহিনী তাদের সংবাদ পেয়ে ছুটে গেল নির্জন স্থানে। হুঙ্কার দিয়ে বলল, কী খবর। সম্রাটের নির্দেশ অমান্য করে তোমরা এখানে খৃষ্টধর্ম চর্চা করছ? এতো বড় তোমাদের স্পর্ধা! সাথে সাথে তাদের গ্রেপ্তার করে সম্রাট দাকইয়ানূসের সমীপে উপস্থিত করল।

সব শুনে সম্রাট দাকইয়ানূস বিস্ময়ে হতবাক। বলে কী! এরা রাজ পরিবারের, সাম্রাজ্যের উচ্চ পদস্থ ও নগরীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সন্তান। এরাই আমার বিরুদ্ধাচরণ করছে। বিস্ময়ভরা দৃষ্টি তার চোখের তারায়। হায়! এরা তো সবাই যুবক। কৈশোর অতিক্রম করে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছে। সামনে তাদের দীর্ঘ জীবন। এদের নিয়ে তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের কতো আশা-ভরসা কতো ইচ্ছা-তামান্না! সবই কি আমার একটি নির্দেশে ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে। না, এদের একটু অবকাশ দিয়ে দেখা হোক। নতুন ধর্ম ত্যাগ করে ফিরে আসে কি না?

সম্রাট একটু নরম গলায় বলল, তোমরা আমার হুকুম অমান্য করে গোপনে খৃষ্ট ধর্মাচার পালন করছ। প্রতিমাপূজা কর না। শোন! আমার নাম দাক্ইয়ানূস। আমার নির্দেশ মেনে নাও। অন্যথায় পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে।

যুবকদের মাঝে বয়সে বড় মুকসালমীনা। অকপটে সত্য বলা তার চির অভ্যাস। মিথ্যা, অসত্য আর ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে সে সদা সোচ্চার। নির্ভীক কণ্ঠে বলল, সম্রাট মহোদয়! আমরা এমন এক রবের ইবাদত করি যার ক্ষমতা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। আসমান-জমিন, গ্রহ-নক্ষত্রের স্রষ্টা। সকল

প্রশংসা, সকল স্তুতি তাঁরই। মৃত্যুর পর আমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাব। সুতরাং তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত আমরা করতে পারি না। অন্যরাও মুকসালমীনার কথায় সম্মতি প্রকাশ করল।

সম্রাট দাকইয়ানূস তাদের সাহসিকতা ও বিশ্বাসে দৃঢ়তা দেখে দারুণ বিস্মিত হল। ক্রোধের একটা আগুন তার চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়লেও হৃদয়টা যেন এক অপার্থিব দয়া মায়ায় কোমল হয়ে রইল। কঠিন কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারল না।

কিছুক্ষণ পর সম্রাটসুলভ গম্ভীরতাসহ কঠিন স্বরে অনুচরদের নির্দেশ দিয়ে বলল, এদের শরীর থেকে সম্ভ্রান্ত ও রাজকীয় পোশাক খুলে ফেল। শরীরের মূল্যবান অলঙ্কারগুলোও খুলে রেখে দাও। এরা এর যোগ্য নয়।

তারপর যুবকদের দিকে অগ্নিঝরা দৃষ্টি ফেলে বলল, আমি তোমাদের কয়েকদিনের অবকাশ দিচ্ছি। তারপরই আমি দেখে নিব, তোমরা কেমন স্পর্ধা রাখ? কার সামনে দাঁড়িয়ে কী বল? তারপর তাদেরকে দরবার থেকে বের করে দেয়া হল। সম্রাট দাকইয়ানূস পার্শ্ববর্তী আরেকটি শহরে চলে গেল।

চিন্তা! চিন্তা!! চিন্তা!!! মুকসালমীনা ও তার সাথীদের মাথায় ভীষণ চিন্তা। কোথায় আশ্রয় নিবে? কিভাবে সম্রাটের ক্রোধ থেকে বেঁচে থাকবে? কিভাবে সত্য ধর্ম নিয়ে অটল অবিচল থাকবে? এক সময় তারা একটি জায়গায় একত্রিত হল।

বাইজালুস। শহরের অনুতিদূরে এক পার্বত্যগুহা। নীরব নির্জন। সর্বদা কবরের নিরবতা সেখানে বিরাজমান। মানুষের কোন কোলাহল নেই। ভুলেও সেদিকে কেউ যায় না। অনেকে সে গুহার খবরও জানে না। তাঁরা পরামর্শ করল। সে গুহাতে গিয়েই আমরা আত্মগোপন করে থাকব। সাধ্য মত কিছু মুদ্রা নিয়ে রাতের অন্ধকারে সবার অগোচরে সেখানে আশ্রয় নিব।

দিনমণি পশ্চিমাকাশে। রক্তলালিমা ছড়িয়ে যাই যাই করতে করতে অস্তমিত হয়ে গেল। চারদিকে রাতের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল। যুবকরা যার যার বাড়ি থেকে কিছু কিছু মুদ্রা নিয়ে সবার অজান্তে বেরিয়ে পড়ল। নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়ে বাইজালুস গুহার দিকে রওয়ানা হল।

কিছু পথ অতিক্রম করার পর আরেক বিপত্তি দেখা দিল। একটি কুকুরও তাদের অনুসরণ করে আসতে লাগল। তারা ভাবল, হয়তো কোন লা-ওয়ারিশ কুকুর। তাড়িয়ে দিলেই চলে যাবে। একবার, দু'বার, তিনবার চেষ্টা করা হল। কিন্তু না, কুকুরটি কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। আরো কয়েকবার চেষ্টা করার পর হঠাৎ দেখল, কুকুরটি তাদের লক্ষ করে মানুষের মত বলছে, "হে পুণ্যবান ব্যক্তিরা! আমাকে নিয়ে আপনারা পেরেশান হবেন না। আমাকে নিয়ে কোন চিন্তারও কারণ নেই। আমি আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ভালবাসি।" এরপর আর যুবকরা কুকুরটিকে নিয়ে চিন্তিত হল না।

বাইজালুস পার্বত্য গুহায় পৌঁছে তারা নিশ্চিন্তে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হয়ে গেল। দিন-রাত শুধু আল্লাহর ইবাদত, তাসবীহ-তাহলীল ও ধ্যানে কেটে যেতে লাগল। আর কুকুরটি তাদের প্রহরায় সর্বদা গুহা মুখে বসে রইল। এক মুহূর্তের জন্যও সে তার স্থান ত্যাগ করে না। যেন যুবকদের সদা অতন্দ্র নির্ভীক প্রহরী।

তামলীখা। অত্যন্ত সাহসী যুবক। দেখতে সুশ্রী। ক্রয়-বিক্রয়ে দারুণ পারদর্শী। তা ছাড়া চতুর চৌকান্নাও বটে। যুবকরা তাদের মুদ্রাগুলো তাম্লীখার নিকট জমা রাখল। সে মাঝে মাঝে ছদ্মবেশে শহরে যায়। খাবার দাবার ক্রয় করে আনে। সম্রাট দাক্‌ইয়ানূসের খবরাখবর সংগ্রহ করে আনে। এমনিভাবে কয়েকদিন কেটে গেল।

ইতোমধ্যে একদিন দাক্‌ইয়ানূস আফসূস শহরে ফিরে এল। আবার শহর জুড়ে প্রতিমা পূজার ধুম পড়ে গেল। বেদীতে বেদীতে প্রতিমার নামে পশু বধ করার উল্লাস ছড়িয়ে পড়ল। চারদিকে বাঁধভাঙ্গা আনন্দ-উল্লাস বয়ে চলল। তাম্লীখা খাবার ক্রয়ের জন্য শহরে এসেছিল। শুনতে পেল, বাদশাহর অনুচররা তাদের তন্নতন্ন করে খুঁজছে। সে আর বেশিক্ষণ শহরে থাকল না। কিছু খাবার ক্রয় করে সন্তর্পণে শহর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

গুহায় পৌঁছে সাথীদের নিকট শহরের অবস্থা বর্ণনা করল। বলল, দাক্‌ইয়ানূসের অনুচররা আমাদের তন্নতন্ন করে খুঁজে ফিরছে। এখন আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমাদের আর বাঁচার উপায় নেই। হয়তো

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এ গুহায় এসে পৌঁছবে।

তাম্লীখার কথায় তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। কেঁদে কেঁদে দুআ করতে লাগল। অমানুষিক শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য কাকুতি মিনতি করে মুক্তি প্রার্থনা করতে লাগল।

এভাবে দীর্ঘ সময় কেটে গেল। তাম্লীখা বলল, ভাইয়েরা! শান্ত হও। ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থেকে তাঁর উপরই ভরসা করা ছাড়া এখন আমাদের আর কোন উপায় নেই। তাম্লীখার কথায় যুবকদের অন্তরে প্রশান্তির ছোঁয়া লাগল। তাঁরা কিছুটা খাবার গ্রহণ করল।

সূর্য তখন ক্লান্ত। তার চেহারায় সেই প্রখর উজ্জ্বল ভাব নেই। কেমন জানি বিষণ্ন, ফ্যাকাসে, নিস্তেজ। তবুও অস্তায়মান সূর্যটাকে বড় মায়াময় মনে হচ্ছে, বড় অসহায় মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর অন্ধকার নেমে এল। যুবকরা তখনও গুহায় যার যার ইবাদতে ডুবে আছে। যিকির ও তাসবীহ পাঠ করতে করতে এক সময়ে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়ল। গুহা মুখে কুকুরটি সামনের দু'পা প্রসারিত করে তখনও বসে আছে। কুকুরটি তাঁদের অতন্দ্র প্রহরী। বিশ্বস্ত দেহরক্ষী। ডাগর নয়ন মেলে জ্বলজ্বল চোখে তাকিয়ে আছে। ঠিক এমনি অবস্থায় কুকুরটিও ঘুমিয়ে পড়ল। মুদ্রাগুলো আর অবশিষ্ট কিছু খাবার তাদের শিয়রে পড়ে রইল।

সম্রাট দাক্‌ইয়ানূসের বাহিনী ও অনুচররা কোথাও যুবকদের খুঁজে পেল না। যুবকরা যেন বাতাসের ইথারে মিশে গেছে। সম্রাট দাক্‌ইয়ানূস কিন্তু বিষয়টি সহজে মেনে নিল না। যুবকরা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় দারুণ ক্ষুব্ধ হল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল। কিন্তু কিছুই তো এখন আর তার করার নেই। তবুও নিরাশ হল না। বিদ্রোহী এই যুবকদের নাম ঠিকানা আর কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ শিলাখণ্ডে লিখে সরকারী কোষাগারে সংরক্ষিত করে রাখল। যেন পরবর্তী কোন সময়ে তারা শহরে এলে শহরের শাসক তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দিতে পারে।

এরপর আর তেমন কিছু ঘটল না। সময় তার নিজস্ব গতিতে তরতর করে বয়ে চলল। আফসোস, শহরে কত শাসনকর্তা এল আর গেল। রোম

সাম্রাজ্যের সিংহাসনেও অনেক সম্রাট এল। ইজিয়ান সাগরের স্রোতে ভেসে বহু কিছু অনন্তে হারিয়ে গেল। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ। এভাবে বিবর্তনের সূত্র ধরে তিনশত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল।

কালের ঘড়ির কাঁটা তখন ৫৫০ খৃষ্টাব্দে এসে দাঁড়িয়েছে। রোম সাম্রাজ্যের চিত্র তখন একেবারে পাল্টে গেছে। হাতেগড়া প্রতিমা নিয়ে আর কোন আহামরি নেই। বেদীতে বেদীতে আর পশু বধের উল্লাস নেই। গোটা রোম সাম্রাজ্যে খৃষ্টধর্মের জয়জয়কার। পথের বাঁকে বাঁকে গড়ে উঠেছে সুন্দর সুন্দর গির্জা। সবাই ঈসা আ.-এর অনুসারী। খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী। খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী সম্রাট বাইদুসীসের হাতে রোম সাম্রাজ্যের দণ্ডমুণ্ড। বাইদুসীস পুণ্যবান মানুষ। বাইদুসীসের সুশাসনে সবাই বিমুগ্ধ। বিমোহিত।

হঠাৎ সাম্রাজ্য জুড়ে এক বিপত্তি দেখা দিল। ইহকাল নিয়ে এ বিপত্তি নয়। পরকাল নিয়েই এ বিপত্তি। সাম্রাজ্যের একদল লোক পরকালকে অস্বীকার করে বসল। তারা বলে বেড়াতে লাগল, পরকাল বলতে কিছুই নেই। এ জীবনই মানুষের শুরু। এজীবনই মানুষের শেষ। মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে পচে গলে অনন্তের বুকে মিশে যাবে।

এর কিছু দিন পর আরেক বিপত্তি দেখা দিল। একদল লোক পরকালকে তো অস্বীকার করল না। তবে পরকালে সশরীরে উত্থানকে অস্বীকার করল। তারা বলে বলে বেড়াতে লাগল, মর্ত্যের এই দেহ মাটিতে পচে গলে অনন্তের বুকে মিশে যাবে। পরকালে শুধুমাত্র রূহের উত্থান হবে। রূহই কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। দেহ নয়।

এ নিয়ে মানুষের মাঝে জল্পনা কল্পনার শেষ নেই। বাকবিতণ্ডার অন্ত নেই। উভয় দলের পশ্চাতে রয়েছে বিদগ্ধ পাদ্রী। যুক্তি তর্কে তাদের সাথে পেরে উঠা বড়ই কঠিন। কিছু মানুষ একত্রিত হলেই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। তারপর হয় বাকবিতণ্ডা। তারপরই সৃষ্টি হয় উত্তেজনা। মারমুখী হয়ে উঠে ভক্ত মানুষের দল। অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটছে সাম্রাজ্যের এখানে সেখানে।

এহেন পরিস্থিতিতে সম্রাট বাইদুসীস দারুণ চিন্তায় পড়ে গেল। কী করবে? কিভাবে সাম্রাজ্যের লোকদের একই বিশ্বাসে আনবে? এর কোন পন্থা,

পদ্ধতিও ভেবে পাচ্ছে না। সময়ের সাথে সাথে এ ভুল আকীদা-বিশ্বাসের লোকদের সংখ্যাও বেড়ে চলল। সম্রাটের দুশ্চিন্তা আর পেরেশানীও বেড়ে চলল। সম্রাট বাইদুসীসের সারদিন শুধু চিন্তা আর চিন্তা।

একদিন দিশেহারা সম্রাট এক আজব কাণ্ড করে বসল। রাজপ্রাসাদের এক নির্জন কামরায় চলে এল। দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর রাজকীয় বাহারী পোশাক খুলে ফেলে দিয়ে ছেঁড়াফাড়া মিসকিনের পোশাক পরিধান করে ছাইয়ের স্তুপের উপর বসে কাঁদতে শুরু করল। আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে সে যে কী কান্না! চিন্তা করাই দুষ্কর। বিনয় বিগলিত নেত্রে শুধুই কাঁদছে। আর রোরুদ্য কণ্ঠে দু'আ করে বলছে, হে আমার রব! হে আল্লাহ! হে আসমান জমিনের স্রষ্টা! আমার চোখের সামনে আপনার বান্দারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে অথচ আমি কিছুই করতে পারছি না। হে আল্লাহ! এমন নিদর্শন দেখান যা দ্বারা এ পথভ্রষ্ট লোকেরা বুঝতে পারে যে, পরকাল আছে আর পরকালে মানুষ সশরীরে আপনার নিকট উপস্থিত হবে। হে আল্লাহ! আমার অন্তরের এ তামান্না, এ আরজুটুকু কবুল করে নিন। আমাদের এ বিপত্তি থেকে মুক্তি দিন।

এভাবে কাঁদতে কাঁদতে এক সময় সম্রাটের হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে গেল। তাঁর বিশ্বাস হল, আল্লাহ তার দু'আ কবুল করেছেন। শীঘ্রই তিনি কোন নিদর্শন দেখিয়ে পথভ্রষ্ট বান্দাদের হিদায়াতের ব্যবস্থা করবেন।

একদিকে তিন শত বছর পর বাইজালুস পার্বত্য গুহায় ঘুমন্ত সেই সাত যুবকের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখে হাত ঘষতে ঘষতে তারা উঠে বসল। চেয়ে দেখল সকাল হয়ে গেছে। সুন্দর সকাল। চারদিকে ঝলমলে আলোর বন্যা। ঘুমাবার আগের কথা আবার তাদের মনের পর্দায় ভেসে উঠল। সম্রাট দাকইয়ানুসের হিংস্র চেহারা আর পাষাণ হৃদয়ের কথা মনে পড়ল। ভয়ে ভয়ে শরীর শিহরিত হয়ে উঠল। আবার আল্লাহর ইবদতে মগ্ন হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ ইআদত করার পর একজন আরেকজনকে বলল, আচ্ছা বল দেখি, আমরা কতক্ষণ ঘুমিয়েছি?

উত্তরে অন্যজন বলল, তোমাদের রবই সমধিক জ্ঞাত তোমার কতকাল ঘুমিয়েছ।

তামলীখা বলল, যদি তোমরা আজ শহরে থাকতে তা হলে সম্রাট দাকইয়ানুস তোমাদের প্রতিমাপূজা করতে বাধ্য করত। আর যদি তোমরা তা না করতে তাহলে তোমাদের সে নির্মম ভাবে হত্যা করত।

মুক্সালমীনা সবার মাঝে অনন্য। তামলীখার কথা শুনে বলল, ভাইয়েরা আমার! ইহলোকের এ জীবন স্বপ্নের মতই ক্ষণস্থায়ী। শীঘ্রই আমরা আমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করব। তাই যদি আমরা ধরা পড়ে যাই আর সম্রাট আমাদের প্রতিমা পূজায় বাধ্য করতে চায়, তা হলে আমরা ঈমানের স্বাদ পাওয়ার পর কিছুতেই কুফুরিতে ফিরে যাব না।

প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে তাদের। ক্ষুধায় পেট চোঁ-চোঁ করছে। একজন বলল, ভাই তামলীখা! শহরে গিয়ে আমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে আস। দারুণ ক্ষুধা পেয়েছে। অন্যরা বলল, হ্যাঁ আমাদেরও খুব ক্ষুধা পেয়েছে। খাবার নিয়ে আসবে আর শহরের পরিস্থিতিও জেনে আসবে। সম্রাট দাকইয়ানুসের মতিগতি কী, ভালভাবে জেনে আসবে। তবে সাবধান! খুব সতর্কতার সাথে, অত্যন্ত চৌকান্নার সাথে কাজ সেরে ফিরে আসবে।

তামলীখা ছদ্মবেশ ধারণ করে গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ল। সাথে কিছু মুদ্রাও নিয়ে নিল। স্বাভাবিক চলাচলের পথ ছেড়ে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে থেকে থেকে অস্বাভাবিক পথ ধরেই এগিয়ে চলল।

তামলীখা যখন শহরের ফটক গলিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল, তখন তাঁর কাছে সব আজব মনে হতে লাগল। গতকালের দেখা আফসূস শহরের সাথে আজকের আফসূস শহরের কোন মিল নেই। কোথায় সেই বাড়িঘর, গাছপালা। কোথায় সেই রাস্তাঘাট। পরিচিত কোন মানুষকেই তো সে আজ দেখতে পাচ্ছে না। যতই সামনে অগ্রসর হচ্ছে ততই তার বিস্ময় বেড়ে চলল। গতকাল চারদিকে ছিল প্রতিমার ছড়াছড়ি। পথের বাঁকে বাঁকে ছিল অসংখ্য মন্দির। বেদীতে বেদীতে বলি দেয়া হত শত শত পশু। কিন্তু আজ আর তার কিছুই নেই। চারদিকে গির্জা। এখানে গির্জা সেখানে গির্জা। সবাই খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। এসব কী! সবই যেন ভোজবাজির খেলা।

তামলীখা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। ভাবল, তাহলে কি আমি পাগল হয়ে গেলাম? না, স্বপ্নের জগতে আছি। তামলীখা বাজারে গেল। দেখল, মানুষ কথার ফাঁকে ফাঁকে ঈসা আ. এর নামে শপথ করে। খৃষ্ট ধর্মের কথা বলে। তাঁর বিস্ময় ভাব এবার চরমে গিয়ে পৌছল। ভাবল, তাহলে কি আমি অন্য শহরে এসে পড়লাম?

দেখল, অদূরে এক ব্যক্তি একাকী দাঁড়িয়ে আছে। তামলীখা তার দিকে এগিয়ে গেল। বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, ভাই এ শহরের নাম কি? লোকটি ধমকে উঠে বলল, আরে গাধা, তাও বুঝি জানো না! এ শহরের নাম আফসূস। যা, দূর হ!

তামলীখা মনে মনে ভাবতে লাগল, নিশ্চয়ই তাহলে আমি পাগল হয়ে গেছি। আমার মস্তিষ্কে বিকৃতি ধরেছে। নইলে তো এমন হওয়ার কথা নয়। বলা যায় না কখন কোন বিপত্তি ঘটে যায়। তাই দ্রুত শহর থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। কিছু খাবার কিনে আর দেরি করা যাবে না।

তামলীখা এক দোকানীকে কয়েকটি মুদ্রা দিয়ে বলল, ভাই! আমাকে এর বিনিময়ে কিছু খাবার দাও। দোকানী মুদ্রাটি হাতে নিয়ে হতবাক। একী! এতো এ যুগের মুদ্রা নয়। বহু বৎসর আগের মুদ্রা। বিস্মিত দোকানী পার্শ্ববর্তী দোকানীকে মুদ্রাটি দেখাল। আরো কয়েকজন দোকানী এসে জড়ো হল। সবাই বিস্মিত। হতবাক। বাঁকাদৃষ্টিতে তারা তামলীখার দিকে তাকাল। তারপর ফিসফিসিয়ে কি যেন বলল। দোকানীদের আচরণে তামলীখা ভয় পেয়ে গেল। ভাবল, তারা হয়তো তাকে চিনতে পেরেছে। এখনই তাকে সম্রাট দাক্ইয়ানুসের নিকট নিয়ে যাবে। কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বলল, ভাই দোকানী! আমার ঐ মুদ্রার প্রয়োজন নেই। আমি চললাম।

দোকানীরা সন্দেহ করেছিল, যুবকটি হয়তো কোন গুপ্তধন পেয়েছে। তামলীখার কথায় তাদের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হল। তারা তামলীখাকে ঘিরে ধরল। ধমক দিয়ে বলল, সত্য কথা বল, যে গুপ্তধনটি পেয়েছিস তা কোথায়? দেখিয়ে দে। তাহলে তোকেও তার কিছু দিব। নইলে তোকে জীবনে মেরে ফেলব। একেবারে সম্রাটের হাতে তুলে দিব।

তামলীখা ভাবল,যার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি এবার বুঝি তার হাতেই গিয়ে পড়তে হবে। বিনীত কণ্ঠে বলল, ভাই! আমি কোন গুপ্তধন পাই নি। এগুলো আমার মুদ্রা। আমি খাদ্য ক্রয় করতে এগুলো নিয়ে এসেছি। দোকানীরা তাকে নানা ভাবে চাপ দিল। কিন্তু তামলীখার ঐ একই কথা, আমি কোন গুপ্তধন পাই নি। আমি মিথ্যা বলছি না।

দোকানীরা তখন ক্ষিপ্ত হয়ে গায়ের চাদর খুলে তার গলায় পেঁচিয়ে টানতে টানতে শাসনকর্তার নিকট নিয়ে যেতে লাগল। রাস্তায় নামতেই উৎসাহী জনতার দল হৈ হৈ করতে করতে ছুটে এল। দোকানীরা বলল, ছোকরা গুপ্তধন পেয়েছে। কিন্তু কিছুই বলে না। দারুণ শক্ত। শাসনকর্তার হাতেই তাকে তুলে দিব। তাহলে মজা দেখবে।

একজন পৌঢ় বলল, দেখি কে? না তো, এ তো এ শহরের কেউ নয়। অন্যরা বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরাও তাকে চিনি না। মনে হয় অন্য কোন শহরের লোক হবে।

তামলীখার চোখে ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি। বারবার চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকায়। তাঁর বিশ্বাস, নিশ্চয় তার আত্মীয়স্বজনের কেউ আসবে। তাকে জনতার হাত থেকে উদ্ধার করবে। কিন্তু না। পরিচিত কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। অসহায় তামলীখা। ভয়াতুর দৃষ্টিতে শুধু মানুষের চেহারায় ফ্যালফ্যল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে, হায়! কেন খাবার কিনতে এলাম। এবারতো যালিম সম্রাট দাকইয়ানূসের নির্দেশে জীবনটাই শেষ হবে। অশ্রুভেজা চোখ আকাশের দিকে তুলে তামলীখা দু'আ করে, হে আল্লাহ! হে আসমান ও যমীনের রব! আমাকে সাহায্য কর। আমাকে মনোবল দাও। আমি যেন যালিম সম্রাটের অত্যাচারে ঈমানহারা না হয়ে যাই। আমি যেন সত্য ধর্মে চির অবিচল থাকতে পারি।

দোকানীরা তাকে শাসনকর্তা আরইয়ূসের নিকট নিয়ে গেল। আরইয়ূস দোকানীদের বক্তব্য শুনল। তারপর মুদ্রাগুলো হাতে নিয়ে দেখল। হ্যাঁ....সত্যই তো! যে তারিখ আছে তাতে বুঝা যায়, মুদ্রাগুলো তিন শত বৎসর আগের। তারপর তামলীখার দিকে তাকাল। কী সুন্দর নিষ্পাপ

চেহারা। নূরে নূরে উজ্জ্বল। আবিলতার কোন চিহ্নও নেই। এ মুখ কখনো মিথ্যা বলতে পারে, মিথ্যার কল্পনাও করা যায় না। তামলীখার চেহারা দেখে আরইয়ূস আনমনা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল, আমি এ শহরের শাসনকর্তা। আশা করি, আমার সাথে মিথ্যা বলবে না। আমি যা জিজ্ঞেস করব তার ঠিক উত্তর দিবে।

আচ্ছা বল দেখি, তুমি এই গুপ্তধন কোথায় পেয়েছ? তামলীখা একেবারে নির্বিকার। বলল, না, আমি কোন গুপ্তধন পাই নি। এটা আমার পিতার মুদ্রা। আমি তার কাছ থেকে এটা নিয়েছি। এ শহরেই এটা তৈরী হয়েছে। এ শহরেই তার প্রচলন আছে। তবে আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি বুঝতে পারছি না, আমাকে নিয়ে এসব কেন করা হচ্ছে? আরইয়ূস নিরব হয়ে রইল। কিছুই বলল না।

একজন বলল, তুমি কে হে যুবক? তোমার পরিচয় কি?

তামলীখা বলল, আমার নাম তামলীখা। সে তার পিতার নামও বলল। তার বাড়ির কথাও বলল। কিন্তু কেউ তাকে, তাঁর পিতাকে বা তাঁদের বাড়ি চিনল না।

একজন বলল, দারুণ মিথ্যুক। দেখ না তার সাহস কত? শাসন কর্তার সামনে দাঁড়িয়ে ডাহা মিথ্যা বলছে।

তামলীখা নির্বিকার। হতভম্ব। যেন একেবারে মূক ও বধির হয়ে গেছে। আর ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

আরেকজনের ব্যঙ্গোক্তি শোন গেল। বলল, পাগল এ যুবকের নিয়ে কি তোমরাও পাগল হয়ে গেলে?

আরেকজনের প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা গেল। বলল, আরে না, না। পাগল নয়। আসল কথাটি লুকাতে চেষ্টা করছে।

এতক্ষণ শাসনকর্তা আরইয়ূস মাথা নত করে যেন চিন্তার এক ভিন্ন জগত ঘুরে এল। মাথা তুলে বলল, যুবক তুমি কি মনে কর, তুমি যা তা বললেই আমরা তোমাকে ছেড়ে দিব। তোমার চারপাশের লোকগুলোকে দেখ। এরা সবাই শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি। আমরাই মুদ্রা তৈরি করি। সুতরাং

যেন তেন কিছু বলে দিলেই কিন্তু আমরা তা বিশ্বাস করব না। তোমার মুদ্রার সিলই বলছে তা তিনশত বছর আগের তৈরি। মিথ্যা বলো না। সত্য বল। রেহাই পাবে। তা না হলে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

তাম্‌খীলা ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আমি আপনাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করব। যদি সঠিক উত্তর দেন তাহলে আমি আমার ঘটনাটি বিস্তারিত বলব।

আরইয়ূস বলল, আচ্ছা জিজ্ঞেস কর। আমি সঠিক উত্তরই দিব।

তাম্‌খীলা ভয়বিজড়িত কণ্ঠে বলল, সম্রাট দাক্বইয়ানূস কোথায় আছেন, কি করছেন, তা কি আমাকে বলতে পারেন?

আরইয়ূস ও অন্যান্যরা বলল, দাক্বইয়ানূস নামের কোন সম্রাট বা বাদশাহ এ যুগে কোথাও আছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে তিনশত বা তার চেয়ে বেশী বৎসর আগে দাক্বইয়ানূস নামে রোমে এক প্রতিমাপূজক সম্রাট ছিল। খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের উপর তার লোমহর্ষক নিপীড়ন ও নির্যাতনের বহু কাহিনী এখনো কিংবদন্তী হয়ে আছে।

তাম্‌খীলা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। এ কী! তাহলে কি আমরা গুহায় তিনশত বৎসর ঘুমিয়ে ছিলাম। তাও কি কখনো সম্ভব। মানুষ কি এতো দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে থাকতে পারে। হ্যাঁ, সবই আল্লাহর লীলা। সবই আল্লাহর খেলা। নিজের অজান্তেই তাম্‌খীলা কিছু সময় ভাবনার জগতে ঘুরে এসে আরইয়ূসের দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, আপনাদের কথা শুনে সত্যিই আমি হতবুদ্ধি। হতবাক। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমি এতক্ষণ সম্রাট দাক্বইয়ানূসের নির্যাতন ও নিপীড়নের ভয়েই ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলাম। সে এক বিস্ময়কর ঘটনা। সম্রাট দাক্বইয়ানূসের আমলে আমরা কয়েকজন যুবক ছিলাম খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। আমরা প্রতিমা পূজা করতাম না। তাই সম্রাট আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হন। আমাদের সামনে তখন ধর্মত্যাগ বা মৃত্যু এ দুটোর যে কোন একটি গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলো না। আমরা তখন পালিয়ে গিয়ে এক পার্বত্য গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেখানেই আল্লাহর ইবাদত করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আজ সকালে আমাদের ঘুম ভাঙল। ক্ষুধার জ্বালায় আমাদের সকলেই অস্থির হয়ে পড়লে আমি কিছু খাবার ক্রয় করতে ছদ্মবেশে শহরে আসলাম। এ হল আমার অবিশ্বাস্য কাহিনী। আমার কথা বিশ্বাস না করলে আমার সাথে সেই গুহায় চলুন। সেখানে আমরা সাথীদেরও সাক্ষাৎ পাবেন।

তাম্‌খীলার কথা শুনে সবাই হতবাক হয়ে গেল। সবার জিহ্বা যেন আড়ষ্ট। সবাই যেন মূক। যা দেখছে আর যা শুনছে তা কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। কী মহান আল্লাহ! কত শক্তি তাঁর! তিনশত বৎসর ঘুমে ফেলে রেখে আবার জাগ্রত করলেন। নিশ্চয় এ মহা শক্তিশালী আল্লাহ মানুষকে পরকালেও সশরীরে পুনরুজ্জীবিত করবেন। হিসাব-নিকাশ নিবেন। জান্নাত-জাহান্নাম দিবেন। ভাবনার জগতের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সবার হৃদয় হিদায়াতের আলোয় আলোকময় হয়ে উঠল। হৃদয়ের গলিঘুপচি দিয়ে সকল অন্ধকার আর গোমরাহী দূরে হয়ে গেল।

আরইয়ূসের মাথায় তখন অন্য চিন্তা। ভাবছে, ঘটনাটি বিস্ময়কর ও রহস্যঘেরা হলেও এর মাঝে আল্লাহর অপার কুদরতের বিকাশ ঘটেছে। সম্রাট বাইদূসীসকে না জানিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া ঠিক হবে না। সাথে সাথে সম্রাট বাইদূসীসের নিকট সংবাদ পাঠাল।

ঘটনাটি আদ্যপান্ত শুনে সম্রাট ভাবাবেগে আকুল হয়ে উঠলেন। অশ্রুসজল হয়ে উঠল তাঁর চোখ। কৃতজ্ঞতায় নত হয়ে গেল তাঁর শির। আর দেরী করলেন না। সাথে সাথে আফসূস নগরীতে ছুটে এলেন।

সম্রাট বাইদূসীসের সামনে তাম্‌লীখা উপস্থিত। ভাবাবেগে আকুল সম্রাটের মন। বললেন, হে যুবক! তোমার নাম কি? কী তোমার পরিচয়?

তাম্‌লীখা অকপটে বলল, আমি এ শহরের একজন অধিবাসী। আমার নাম তাম্‌লীখা। কয়েকদিন আগে আমরা কয়েকজন যুবক সম্রাট দাক্বইয়ানূসের অত্যাচারের ভয়ে শহর থেকে পালিয়ে পার্বত্য গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম।

হঠাৎ সম্রাট বাইদূসীসের মস্তিষ্কের টিস্যুতে এক আলোর ঝলক বিকিরিত হল। সাম্রাজ্যের কোষাগারে তো একটি ফলকে কয়েকজন যুবকের কথা লিখা আছে। শুনেছি, বহুকাল আগে এরা সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে

কোথায় আত্মগোপন করেছিল। এরপর কেউ আর তাদের কোন খোঁজ খবর পায় নি। তবে কি এ যুবক তাদের একজন? প্রশ্নবোধক চিহ্নটি তাঁর চোখের তারায় বড় হতে হতে অনন্তে মিশে গেল। সাথে সাথে সম্রাটের নির্দেশে ফলকটি উপস্থিত করা হল। সম্রাট দেখলেন, ফলকে তাম্‌লীখার নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। সম্রাট অন্যদের নাম বললে তাম্‌লীখা সম্মতি জানিয়ে বলল, হ্যাঁ, তারা আমার সাথী। তারা এখন ঐ গুহায় আছে।

তাম্‌লীখার এ কথা শুনে সবার বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এরাই তিনশত বৎসর পূর্বের সেই যুবকদল যারা সম্রাট দাক্‌ইয়ানূসের নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করেছিল। তারপর ঘুমের ঘোরে তিনশত বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে। আল্লাহ তাদের জীবিত রেখেছেন। এরপর তারা আবার জাগ্রত হয়েছে।

সম্রাট বাইদূসীসের বিশ্বাস হল, আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করেছেন। তিনি এ নিদর্শনের মাধ্যমে জগতবাসীকে একথাই বুঝালেন যে, মানুষ মৃত্যুর পর আল্লাহর ইচ্ছায় আবার জীবিত হবে এবং সশরীরে জীবিত হবে। তারপর আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে।

যারা পরকালকে বিশ্বাস করত না বা সশরীরে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার কথা মানত না, এ ঘটনার পর তারা তাদের মত পরিহার করে নিল এবং চির সত্য আকীদা-বিশ্বাসকে মেনে নিল।

সম্রাটের মন এবার অস্থির হয়ে উঠল। বাকি ছয়জন যুবককে দেখার জন্য মন ছটফট করতে লাগল। বললেন, চল তাম্‌লীখা! আমরা তোমাকে নিয়ে সেই পার্বত্য গুহায় যাব। তোমার পুণ্যবান সাথীদের সাথে সাক্ষাৎ করব। দু'আ নিব।

সাম্রাজ্যের পদস্থ ও উচ্চ শ্রেণীর কিছু লোককে নিয়ে সম্রাট বাইদূসীস তাম্‌লীখার সাথে বাইজালুস পার্বত্য গুহার পথে রওনা হলেন। গুহার অনতিদূরে পৌঁছে তাম্‌লীখা বলল, আপনারা এখানে একটু অপেক্ষা করুন। আমি আমার সাথীদের সংবাদ দিয়ে আসি। এভাবে হঠাৎ আমরা সবাই গুহায় উপস্থিত হলে তারা হয়তো ভয় পেয়ে যাবে। তারপর সবাইকে রেখে তাম্‌লীখা চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর তাম্‌লীখা ফিরে এসে সবাইকে নিয়ে গুহায় গেল। তাম্‌লীখার সাথে সাথে ছিল সম্রাট বাইদূসীস। গুহায় পৌঁছে তারা যুবকদের সাথে সাক্ষাৎ করল। অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে কথাবার্তা বলল। আলাপ-আলোচনা করল। এরপর তারা সম্রাটকে বিদায় জানিয়ে বলল, আল্লাহ আপনাকে হিফাজত করুন। আল্লাহর রহমত ও করুণা আপনার উপর বর্ষিত হোক। আপনার রাজ্যকে আল্লাহ হিফাজত করুন। মানুষ ও জীনের সর্বপ্রকার ক্ষতি থেকে আপনাকে দূরে রাখুন।

এরপর তারা আবার তাদের মৃত্তিকাশয্যা গ্রহণ করল ও ঘুমিয়ে পড়ল। আল্লাহ তখন তাদের মৃত্যুদান করলেন। সম্রাট বাইদূসীস তাদের লাশকে কাপড়ে আবৃত করে রেখে প্রত্যেকের জন্য একটি করে স্বর্ণের বাক্স তৈরী করার নির্দেশ দিল। সম্রাটের আন্তরিক ইচ্ছা, তাদের লাশগুলোকে স্বর্ণের বাক্সে রেখে দাফন করা হবে।

চারদিকে রাতের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল। ক্লান্ত দেহ নিয়ে সম্রাট বাইদূসীস শয্যা গ্রহণ করলেন। সাথে সাথে হারিয়ে গেলেন অন্য জগতে। একেবারে স্বপ্নের জগতে। দেখলেন, গুহার সেই যুবকরা তার নিকট এসে অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলছে, শোন সম্রাট বাইদূসীস! আমাদের স্বর্ণ দিয়ে তৈরী করা হয় নি। রৌপ্য দিয়েও তৈরী করা হয় নি। আমরা মাটির তৈরী আল্লাহর মাখলুক। মাটিতেই আমাদের মিশে যেতে হবে। সুতরাং গুহায় আমরা যেভাবে ছিলাম সেভাবেই আমাদের থাকতে দাও। কিয়ামত পর্যন্ত আমরা মাটিতেই মিশে থাকতে চাই। এ স্বপ্নের পর সম্রাট তার ইচ্ছা পরিহার করলেন।

কিন্তু তারপরও তো একটা কিছু করতে হবে। ফলে সম্রাটের নির্দেশে সে গুহা-মুখে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হল। মানুষ সেখানে আল্লাহর ইবাদত করে। আল্লাহর যিকির আযকার করে। ধ্যান ও সাধনায় মগ্ন হয়।

ইতিহাসের পাতায় এখনো তারা (Seven sleepers of Ephcsus) 'আফসূস নগরীর ঘুমন্ত সাত ব্যক্তি' নামে খ্যাত হয়ে আছে। পাশ্চাত্যের অনেক শহরে তাদের নামে বহু গির্জা তৈরী করা হয়েছে। কুরআন শরীফের সূরা কাহফে এই ঘটনাটির বর্ণনা রয়েছে এবং ঘটনাটির গুরুত্বের কারণে

সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে সূরা কাহফ। পনেরতম পারার প্রসিদ্ধ সূরা। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ কুরআনে তাদের এ কাহিনী পাঠ করে বিশ্বাস করবে যে, পরকালে মানুষ সশরীরে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহই তাদের কৃতকর্মের বিচার করবেন ও জান্নাত বা জাহান্নামের ফয়সালা করবেন। এ সব বিষয়ে আল্লাহই ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের বিশ বৎসর পূর্বে এ ঘটনাটি ঘটেছিল। তখনকার দুনিয়ায় জ্ঞানী গুণী সবাই এ ঘটনার কথা জানত। বিশ্বাস করত। অকপটে স্বীকার করত। বলে বেড়াত।

আস্‌হাবুল জান্নাহ*

বাগান। সবুজ শ্যামলিমায় ভরা এক ফল বাগান। যেমন বিস্তৃত তেমনই প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্যে ভরপুর। ফুরফুরে শীতল স্নিগ্ধ বায়ুরা মর্মর আওয়াজ তুলে সর্বদা সেখানে নেচে বেড়ায়। ক্ষণেক্ষণে সুকণ্ঠ পাখিরা শিস দেয়। কেঁপে উঠে ইথারের তরঙ্গমালা।

ভরা মৌসুমে পাকা খেজুরের সারি সারি স্তবক যখন খেজুর গাছগুলোতে ঝুলতে থাকে, স্বাদে-রসে ভরা আঙ্গুরের থোকাগুলো যখন ভারসাম্য হারিয়ে পড়ি পড়ি করে মাচায় মাচায় ঝুলতে থাকে, অপূর্ব মিষ্টি সৌরভে যখন চারদিক মৌ মৌ করতে থাকে, মধু মক্ষিকারা উল্লসিত হয়ে যখন গুঞ্জন তুলে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়তে থাকে, তখন বাগানের পরিবেশ আরো প্রাণবন্ত, আরো মোহময়, আরো প্রপঞ্চময় হয়ে উঠে। দর্শকের অপাঙ্গদৃষ্টি বার বার লুটিয়ে পড়ে। অনায়াশে জিহ্বায় লালার আগমন শুরু হয়।

হযরত ঈসা আ. এর পর তাঁরই অনুসারী এক অজ্ঞাত বৃদ্ধ খৃষ্টান ছিলেন এ বাগানের মালিক। ইয়ামেন থেকে দু'মাইল দূরে যার্‌ওয়ান নামক কুঞ্জ

---

* আস্‌হাবুল জান্নাহ : অর্থ বাগানের মালিকগণ। খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী এক দানশীল পিতার ইন্তেকালের পর পুত্ররা দান করা বন্ধ করে দিল এবং চরম ঔদ্ধত্য ও স্পর্ধা প্রকাশ করল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের বাগান ধ্বংস করে দিলেন। এ বাগানের মালিকদের আস্‌হাবুল জান্নাহ বলা হয়।

ছায়ায় আশ্রয়ী এক পল্লীতে ছিল এ বাগানটি।

বৃদ্ধ মালিকের হৃদয়ে নিবিড়ভাবে মিশে আছে আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসা। আল্লাহর সৃষ্টির প্রেম ও ভালোবাসা। হযরত ঈসা আ. এর অপার ভক্তি ও শ্রদ্ধা। তাছাড়া জ্ঞানের আলোয় প্রদীপ্ত তাঁর চিন্তা-চেতনা। তাই সৃষ্টির সেবার মাঝেই বৃদ্ধ খুঁজে পায় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেযামন্দি। গরীব, দুঃখী, অসহায় নিরন্ন বিপন্ন মানুষের দল ছুটে আসে। ভিড় করে বৃদ্ধের সামনে। সবার চোখে মুখে কিছু একটা পাওয়ার আশা। ঠোঁটের কোণায় জীবন সংগ্রামে হেরে যাওয়ার অব্যক্ত করুণ কাহিনী। ছেঁড়া তালিযুক্ত বস্ত্র, ঝরা পাতার মত শুকনো নীরস কঙ্কালসার দেহ, কোটরে বসে যাওয়া চোখ, বিশুষ্ক ঠোঁট, কাঁপা কাঁপা হাত, এসব দেখতে দেখতে বৃদ্ধের দুচোখ অশ্রুতে ভরে যায়। মেদুর বিষণ্নতা ছায়া ফেলে তাঁর মুখমণ্ডলে। গুমরে কাঁদতে থাকে তাঁর হৃদয়।

ফল পাড়া শেষ হয়ে গেলে বৃদ্ধ এক বৎসরের প্রয়োজনীয় ফল রেখে দেন। তারপর অবশিষ্ট সব কিছু অনাথ, এতীম আর গরীব মিসকিনদের মাঝে বিলিয়ে দেন। দিতে দিতে যখন একেবারে শেষ হয়ে যায় তখন বাগানের এক নির্জন কোণে আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। কেঁদে কেঁদে দু'আ করেন, হে আল্লাহ! হে পরওয়ারদিগার! সৃষ্টির সেরা মানুষের সেবায় আমার এই ক্ষুদ্র জীবনকে উৎসর্গ করার সাহস দিন। শক্তি দিন। মনোবল দিন। এভাবে দীর্ঘক্ষণ দু'আ করার পর বৃদ্ধ যখন বাগান থেকে বেরিয়ে যান, তখন তৃপ্তিময় হাসির কিরণ মেখে তাঁর মুখখানা ঝলমল করতে থাকে।

তবে বৃদ্ধের ছেলেদের চিন্তা-ভাবনা একটু ভিন্ন ধারার। অন্য প্রকৃতির। বৃদ্ধের এই সীমাহীন উদারতা, দানশীলতা আর গরীব, মিসকীন, অসহায় ও অনাথ মানুষের জন্য এই আহামরি তারা পছন্দ করে না। আশৈশব তারা দেখে আসছে অথচ বাগানের সুফল তারা ভোগ করতে পারে না। প্রত্যেক বৎসরই বিপুল পরিমাণের ফলমূল গরীব মিসকীন আর অনাথ মানুষেরা লুটে নেয়। অনেক সময় তারাও ভাগে কম পায়। তাই তাদের অন্তরে একটা মর্মজ্বালা নিরন্তর মাথা কুটে মরে।

একদিন তারা ভাগ্যের সাথে বুঝাপড়া করার জন্য পরামর্শ করে বৃদ্ধের নিকট এল। একজন বিনয় বিগলিত কণ্ঠে বলল, আব্বা, একটি কথা বলব।

বৃদ্ধ বললেন, বল কী বলবে?

ছেলে বলল, আব্বা! আমরা আপনার সন্তান। আপনার হৃদয়ের টুকরা। চোখের মনি, কিন্তু আমাদের প্রতি আপনার এ চরম অবহেলা কেন? বাগানের ফলগুলো পেড়ে প্রায় সবগুলো ঐ গরীব মিসকীনদের হাতে তুলে দেন। আমরাও ভাগে কম পাই। এটা কেমন বিচার? এরা ঔদরিক। যা পায় তাই খেয়ে এক দিনেই শেষ করে দেয়। তারপর আবার ঐ ভিক্ষার ঝোলা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এদের এতো দিয়ে লাভ কি?

আরেকজন একটু কেশে বলল, আব্বা! আমার কিছু বলার আছে।

বৃদ্ধের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। অশুভ কিছু একটা আঁচ করলেন। বললেন, বেশ বল।

ছেলে বলল, আব্বা! আপনি যেভাবে দান-দক্ষিণা করছেন তাতে তো আমাদের ভবিষ্যত অন্ধকার। মনে হচ্ছে, কোন সম্পদ আর বাকি রাখবেন না। আপনার পরে কি আমরা অন্নের সন্ধানে পথে বিপথে ঘুরে বেড়াব?

আরেক ছেলে কি যেন বলতে উদ্যোগ নিল। বৃদ্ধ তখন তর্জনী তুলে কথা বন্ধ করার ইশারা করলেন। চেহারা গলিয়ে তাদের হৃদয়ের কথা অনুধাবন করার চেষ্টা করলেন। তারপর সময়ের আবরণ ভেদ করে যেন ভবিষ্যতের পৃথিবীতে একটু বিচরণ করে এলেন। ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত শির শির করে তার পিঠ বেয়ে নেমে এল। বৃদ্ধের কণ্ঠ অত্যন্ত ধীর। দারুণ গম্ভীর। বললেন, তোমরা একটু ভুল ভাবনায় নিমজ্জিত আছ। এ ধন সম্পদ যা তোমরা আমার মনে করছ আসলে এগুলো আমার নয়। এগুলো আল্লাহর। আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন যেন আমি তা সঠিক ও সুন্দর পথে ব্যয় করি। অসহায়, দুস্থ, নিরন্ন ও বিপন্ন মানুষদের সহায়তা করি।

সুতরাং আমার এ সম্পদে তাদের অধিকার আছে। আল্লাহর সকল সৃষ্টির অধিকার আছে। আমি কখনো তাদের অধিকার আদায়ে ত্রুটি করি নি।

ভবিষ্যতেও করব না। যতদিন পর্যন্ত আমি তা নিষ্ঠার সাথে আদায় করে যাব, ততদিন আল্লাহ আমার সম্পদে বরকত দান করবেন। প্রবৃদ্ধি দান করবেন।

এটা আমার নিছক গালগল্প নয়। কাল্পনিক জনশ্রুতিও নয়। গোটা জীবন আমি এ বিশ্বাসের উপর চলেছি। এ অবস্থায় কেটে গেছে আমার যৌবন আর পৌঢ়ত্বের সোনালী দিনগুলো। এখন আমি বার্ধক্যের চরম সীমায় উপস্থিত। কেশ আর শ্মশ্রু পেকে সাদা ধবধবে হয়ে গেছে। লোলচর্ম দৈহিক সৌন্দর্য দূর করে দিয়েছে। তারুণ্যের অফুরন্ত শক্তি আর শরীরে নেই। চোখের মনি আর আগের মত আলো দান করে না। আমি এখন পরপারের অপেক্ষায় প্রহর গুনছি। কখন যে ধপ্ করে জীবন-পিদিমটা নিভে যাবে তা বলতে পারি না। তবে তার পূর্বে আমি তোমাদের কিছু উপদেশ দিতে চাই।

আমার মৃত্যুর পর যদি তোমরা আমার মত গরীব মিসকীন, অসহায় ও নিরন্ন লোকদের মাঝে দান-সদকা করে থাক, তাহলে আল্লাহ এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তার উত্তম বিনিময় দান করবেন। আর যদি তোমরা কৃপণতার শিকার হও। দান সদকা বন্ধ করে দাও। তাহলে আল্লাহ সতর্ক করে দিয়েছেন, তিনি কৃপণের সম্পদে বরকত দিবেন না। সত্বর তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ কখনো তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। মনে রাখবে, এ পৃথিবী আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার স্থান। বিপথে গিয়ে উচ্ছল আনন্দে ভেসে বেড়াবার স্থান নয়।

এ উপদেশ বাণী প্রদান করার পর বৃদ্ধ আর বেশী দিন সুস্থ থাকতে পারেন নি। নানা অসুখ বিসুখ তাকে আক্রান্ত করল। শয্যা গ্রহণ করার পর তাঁর ভাঙ্গা শরীর জীবনের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করতে পারল না। দ্রুত বিয়োগান্ত ক পরিণতির দিকে এগিয়ে চললেন। একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ইহলোকের জীবনধারায় ইতি টানলেন।

এরপর সময় যেন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। মৌসুমের আবর্তে বাগানে প্রচুর ফল হল। ফলের ভারে গাছের ডাল পালা নুয়ে পড়ল। প্রচুর

আঙ্গুর ও খেজুর হল। সৌরভ আর মিষ্টি মধুর সুবাসে চারদিক মোহনীয় হয়ে উঠল।

এবারো গরীব, মিসকীন, এতীম অসহায় মানুষেরা ছুটে এল বৃদ্ধের ছেলেদের নিকট। নতুন আশায় মুকলিত তাদের মন। অদ্ভুত একটা দাবীর সুর ফুটে উঠল তাদের কণ্ঠে। ফল পাড়ার দিনের কথা তারা জিজ্ঞেস করল। কিন্তু বৃদ্ধের ছেলেরা নীরব। হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। রহস্যের আবর্তে তাদের ফেলে রাখল।

সন্ধ্যায় অস্তাচলে গিয়ে উপস্থিত হল ক্লান্ত সূর্য। রক্তিমাভা ছড়িয়ে নিস্প্রভ ম্লান মুখে বিদায় নিয়ে অস্তমিত হল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল অন্ধকার। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বৃদ্ধের ছেলেরা তখন পরামর্শে বসল। কী করা যায়? পিতার মত তারাও কি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফলগুলো ফকীর মিসকীন ও অসহায় মানুষের মাঝে বিলিয়ে দিবে, না নিজেরাই রেখে দিবে? যদি তাদের না দেয়া হয়, তাহলে কখন কিভাবে ফলমূল পেড়ে তা বাড়িতে আনবে?

একজন বলল, আর না, এখন থেকে আর পিতার পথের অনুসরণ করা যাবে না। আমাদের ছেলে সন্তান হয়ে গেছে। খরচের পরিধিও বেড়ে গেছে। ভবিষ্যতে আরো বাড়তে থাকবে। সুতরাং ঐ পাগলামী বাদ দাও। নিজেদের ফল নিজেরাই ভাগ করে নিব। নিজেরাই ভোগ করব। কাউকে কিছু দেয়ার প্রয়োজন নেই। অন্যরা তার কথায় সায় দিল।

বয়সে মধ্যবর্তী ছেলেটি ছিল পিতার স্বভাবের অধিকারী। সুখে দুঃখে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। অনাথ নিরন্নকে সাহায্য সহযোগিতা করে।

সে বলল, আপনাদের সিদ্ধান্ত আপনাদের দৃষ্টিতে সুন্দর ও মনোরম হলেও এর মাঝেই লুকিয়ে আছে আমাদের ধ্বংস। কৃপণতার অভিশাপে আমাদের এ ধন-সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। ফকীর মিসকীন আর অসহায় মানুষদের তাই বঞ্চিত করা ঠিক হবে না। তাহলে আল্লাহ আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে বরকত দান করবেন। অপার প্রাচুর্যে তিনি আমাদের ইহজীবনকে সুখময় করে তুলবেন।

তার কথা শুনে ভাইয়েরা সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তাদের আত্মম্ভরিতা ও অহঙ্কারের ফানুসটা ফুলতে ফুলতে একেবারে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হল। বলল, রাখ তোমার ঐ মুন্সিপনা। বস্তাপঁচা নসীহতের এখন আর কোন মূল্য নেই। আমরা যা বলছি তা মেনে নাও। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের মত কাজ কর। নির্বোধ হয়ো না।

তাদের তিরস্কারে মধ্যবয়সী ছেলেটির হৃদয় আর্ত হল। বেদনার আঁচে ভারি হয়ে উঠল তার মন। আর কিছু বলল না।

সর্বশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিল, আগামীকাল একেবারে কাকডাকা ভোরে আমরা বাগানে যাব। অত্যন্ত দ্রুত সকল ফলমূল পেড়ে প্রভাতের নির্মল আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত হওয়ার আগেই বাড়িতে ফিরে আসব। তাহলে ফকীর মিসকীনরা ভিড় করে আমাদের জ্বালাতন করার সুযোগ পাবে না। তাদের উৎপাত থেকে বেঁচে থাকতে পারব। এ সময় তারা এমন অহঙ্কার ও দর্প প্রকাশ করল যে, 'ইনশাআল্লাহ' শব্দটি পর্যন্ত বলল না।

তাদের এ ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতার কারণে ভাগ্যের চাকা পশ্চাতে ঘুরা শুরু করল। যে নেয়ামত আল্লাহ তাদের জন্য তৈরী করেছিলেন তা ধ্বংস করার ফয়সালা করলেন। ভবিতব্য এগিয়ে এল। মাঝরাতে এল প্রচণ্ড ঝড়। একেবারে অগ্নি ঝড়। গোটা বাগানটাকে দুমড়ে মুচড়ে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে ফেলল। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সব কয়লা বানিয়ে ফেলল। গতকালের সবুজ শ্যামল ছায়া-ঢাকা পাখি-ডাকা ফলমূলে ভরা বাগান সময়ের ব্যবধানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। চেনার কোন উপায় বাকি রইল না।

পরামর্শ অনুযায়ী বৃদ্ধের ছেলেরা সেই কাকডাকা ভোরে ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠল। মজুরদের নিয়ে চুপিচুপি বাগানের পথে রওনা হল। চির পরিচিত পথ ধরে তারা অগ্রসর হতে লাগল। বাগানের একেবারে নিকটে এসে হতবুদ্ধিতায় তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। অবাক বিস্ময়ে চারদিকে ইতিউতি চাইতে লাগল। বলল, তাহলে আমরা কি পথ হারিয়ে এদিকে চলে এলাম? গতকাল তো বাগানটি ছিল ফলমূলে টইটম্বুর। পাখির কলকাকলিতে মুখরিত। সুমিষ্ট ঘ্রাণে আমোদিত। কিন্তু আজ এমন দেখছি কেন? নিশ্চয়ই ভুল জায়গায় ভুল পথে এসেছি।

মধ্যবয়সী ছেলেটি চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল। পর্যবেক্ষণ করল। গতকাল তার হৃদয়ে যে জখম হয়েছিল তা দগদগ করে উঠল। ক্ষোভ আর আক্রোশভরা কণ্ঠে বলল, না না, আমরা ভুল পথে আসি নি। এটাই আমাদের বাগান। দরিদ্র অসহায় আর নিরন্ন মানুষদেরকে আল্লাহর নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করার নিয়ত করেছিলাম। তাই আল্লাহ আমাদের বঞ্চিত করলেন। কৃপণতা আর লোভের শাস্তি আমরা পেয়েছি। আমি এ কাজ করতে বারণ করেছিলাম। আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের কথা বলেছিলাম। কিন্তু তোমরা ছিলে আত্মপ্রবঞ্চনায় মোহিত। আমার কথায় কেউ কর্ণপাত কর নি। তাই আল্লাহর গযব এসেছে।

তার কথায় সকলের সম্বিত ফিরে এল। হতাশার মাঝেও তারা আশার আলোর উঁকিঝুঁকি দেখতে পেল। তাদের দুচোখের পাতায় তখন তিরতির করছে জান্নাতবাসী পিতার প্রতি এক আকাশ শ্রদ্ধা। পিতার অন্তিম উপদেশ বাণী ভুলে যাওয়ার এক সমুদ্র অনুশোচনা। তারা বলল, সোবহানাল্লাহ! আল্লাহ পবিত্র মহান। আমরা অন্যায় আচরণ করেছি। নিজেদের উপর যুলুম করেছি। হায় দুর্ভাগ্য! নিঃসন্দেহে আমরা নাফরমান ছিলাম। আল্লাহর হুকুম মানি নি। তবে আশা করি, আমাদের পরওয়ারদিগার সত্বর আমাদের এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করবেন।

আল্লাহ তাদের এ অনুশোচনা, এ তওবাকে কবুল করলেন এবং তাদের পূর্বের বাগানের চেয়ে উত্তম বাগান দান করলেন। তাদের সে বাগানের একেকটি আঙ্গুরের থোকা মানুষের দেহের চেয়ে বড় ও লম্বা হত। প্রত্যেকটি আঙ্গুর মিষ্টি মধুর রসে থাকত পরিপুষ্ট। আর তারা তাদের পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে গরীব মিসকীন অসহায় বিপন্ন ও নিরন্ন মানুষের মাঝে মুক্ত হস্তে হৃষ্টচিত্তে দান করত।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনের ঊনত্রিশতম পারার সূরা ক্বলমে এ কাহিনী বর্ণনা করে মক্কার আপামর জনতাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, যেভাবে বাগানওয়ালারা আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় না করার কারণে শাস্তির মুখোমুখি হয়েছিল। সকল নেয়ামত তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। ঠিক তোমরাও যদি রাসূলের মত মহা নেয়ামত পেয়ে তাঁর

কৃতজ্ঞতা আদায় না কর, তাঁর নির্দেশ মত জীবন পরিচালনা না কর, তাহলে তোমাদের উপরও আল্লাহর শাস্তি নেমে আসবে। তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

তাই আমাদেরও ভেবে দেখতে হবে। আমরা যদি ইসলামের মত মহা দৌলত পেয়ে তার কোন কদর না করি। যদি ইসলামী বিধি-বিধান মেনে না চলি তাহলে আমাদেরও ঐ একই পরিণতি ভোগ করতে হবে।

আস্‌হাবুল উখ্‌দূদ*

বিরান ভূমি। বিরাট বিরান ভূমি। চারদিকে ইট পাথর ছড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে ধসে পড়া দেয়াল। ঝোপঝাড় আর কাটাগুল্মের ছড়াছড়ি। এরই মাঝে এক ব্যক্তি কি এক প্রয়োজনে মাটি খুঁড়ছে। বেশ কষ্ট হলেও অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এক নিবিষ্ট মনেই কাজটি সে করছে। কিছুটা খনন করার পর হঠাৎ মনে হল, কোদালটি যেন কোন ফাঁকা স্থানে ঢুকে পড়েছে। মাটির চাকাটি তুলতেই দেখল, আরে! ভিতরে তো বেশ ফাঁকা। তাহলে ভিতরে কি... আর ভাবতে পারল না। অজানা আশঙ্কায় শরীরটা ছমছম করে উঠল। চরম একটা অনুসন্ধিৎসা তার মনে জেগে উঠল।

সাহসে ভর করে আবার কোদাল চালাল। মাটির আরেকটি চাকা তুলতেই তার চোখ ছানাবড়া। শরীর কাঁপছে। বাকশক্তি যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। লাফিয়ে উপরে উঠল। লোকটির ভয়ার্ত চিৎকার আর ডাকাডাকিতে কিছু লোক ছুটে এল। লোকটি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলছে, ভাই! এ কী দেখলাম!

* আস্‌হাবুল উখ্‌দূদ : অর্থ অগ্নিকুণ্ডের অধিপতিগণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের পূর্বে ইয়ামেনের সর্বশেষ হিময়ারী বাদশাহ ছিলেন যূনাওয়াস। তৎকালের খৃষ্টান ধর্ম বিদ্বেষী এই বাদশাহ নাজরানের খৃষ্টানদেরকে বিদ্বেষবশত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল। তাই তাকে ও তার সহযোগীদের আস্‌হাবুল উখ্‌দূদ বলা হয়।

মাটির নিচে ঐ গর্তে এক ব্যক্তি শুয়ে আছে।

লোকটির কথা শুনেই সবার শরীর ছমছম করে উঠল। সকলের অনুসন্ধিৎসু চোখের সজাগ দৃষ্টি গর্তের ঐ ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পড়ল। একজন বলল, আরে! ঐ তো কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে।

আরেকজন আরেকটু নীচু হয়ে দেখে বলল, আরে দেখ দেখ, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কে যেন শুয়ে আছে।

শুনতে শুনতে অনেকে শুনল। ছুটে এল সবাই। বিস্মিত বিস্ফারিত নয়নে সবাই দেখল, একজন জ্যান্ত বালক সেই অন্ধকার গর্তে শুয়ে আছে। কিছু সাহসী মানুষের উদ্যোগে গর্ত থেকেই সেই শুয়ে থাকা বালকটিকে তুলে উপরে আনা হল। না, জীবিত নয়। মৃত লাশ। দেহের কোথাও কোন বিকৃতি নেই। যেন তরতাজা মানুষ।

তবে বিস্ময়কর হল, বালকটি দু'হাত দিয়ে তার কর্ণমূল ধরে আছে। এটা আবার কি ব্যাপার? এর পেছনে কি কোন রহস্য আছে? উৎসাহী জনতার একজন সাহস করে হাত দুটি একটু সরিয়ে দিলেই দরদর করে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। হাত দু'টি আবার যথাস্থানে রাখতেই রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। তা ছাড়া বালকটির হাতে একটি আংটি। তার মণিতে অঙ্কিত রয়েছে 'রাব্বি আল্লাহ' অর্থ আমার প্রতিপালক আল্লাহ।

বিস্ময়! বিস্ময়!! বিস্ময়!!! চরম বিস্ময়ে সবাই স্থাণুর মত নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। চোখ যা দেখছে মন তা বিশ্বাস করতে পারছে না।

ঘটনাটি ঘটল আরবের অত্যন্ত প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ শহর নাজরানে। উমর রা. এর খিলাফত কালে। এ বিস্ময়কর ঘটনা কি আর দমিয়ে রাখা যায়। মরুর দুরন্ত বায়ুর সাথে পাল্লা দিয়ে ঘটনাটির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দূর-দূরান্তের অনুসন্ধিৎসু মানুষেরা ঘোড়া আর উটের পিঠে চেপে ছুটে এল। দাহরান থেকে এল। আভা থেকে এল। ইয়ামেনের সানআ থেকে এল। তায়েফ থেকে এল। মক্কা থেকে এল।

অবশেষে দারুল খিলাফত মদীনায়ও এ সংবাদ পৌছল। উমর রা. এর মজলিসে এর আলোচনা হল। তিনি এ ঘটনা শুনে দারুণ বিস্মিত হলেন।

তারপর নির্দেশনামা লিখে পাঠালেন। লাশটিকে তার পূর্বের স্থানে রেখে পুনরায় দাফন করে দেয়া হোক।

সে কালের লোকদের মাঝে তখন এ কথাটি প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, এটা আব্দুল্লাহ ইবনে তামেরের লাশ।

কে এই আব্দুল্লাহ ইবনে তামের? কী তার পরিচয়? কী তার জীবন কাহিনী? এ ধরনের বহু প্রশ্নের জওয়াব পেতে নিশ্চয়ই মনটি দারুণ অস্থির হয়ে উঠেছে। চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, তার জীবন কাহিনী শুনতে হলে আমাদের কাল প্রবাহের বিপরীত দিকের পথ ধরে বাঁক ঘুরে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বেশ পিছনে যেতে হবে। চল সেখানে যাই।

হযরত ঈসা আ. কে আল্লাহ তা'আলা আসমানে তুলে নেয়ার পর ৫২ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে মানুষ ভুলে গেছে তাঁর তাওহীদের শিক্ষা। শিরক আর কুফুরির ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে গেছে মানব সমাজ। ইহুদী আর খৃষ্টান জাতির চির শত্রুতা প্রশমিত না হয়ে আরো তীব্র ও প্রকট আকার ধারণ করছে।

খৃষ্টানরা মনে করে, ইহুদীরা তাদের নবী হযরত ঈসা আ. কে হত্যা করেছে। তাই সুযোগের সন্ধানে ওঁৎপেতে থাকে। সুযোগ পেলেই দেরি নয়। অত্যাচরের খড়গ হস্তে তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। নির্মমভাবে হত্যা করে বা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করে।

ইহুদীরা মনে করে, ঈসা আ. জারজ সন্তান। মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার। প্রতারক ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই তারা ঈসা আ. কে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করে। তাঁকে হত্যা করার গর্বে বুক ফুলিয়ে চলে। এ কারণে ইহুদী ও খৃষ্টানরা যে কতো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তার কোন সঠিক তথ্য নেই। ফলে ধর্মকে কেন্দ্র করে পৃথিবী দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। খৃষ্ট ধর্মালম্বীদের নিয়ে একটি শিবির। এতে ছিল রোমান সাম্রাজ্য আর আবিসিনিয়া। অখৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে আরেকটি শিবির। এতে ছিল পারস্য সম্রাজ্য, ইয়ামেন ও ইহুদীরা।

এদিকে আরবের মূর্তি পূজকরা পৃথিবীর দ্বন্দ্বমুখর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জগত থেকে দূরে থাকার কারণে সর্বত্র তাদের যাতায়াত ছিল অবাধ। শাম ইয়ামেন ও ইরাকে তারা নির্বিবাদে যাতায়াত করত। ব্যবসা বাণিজ্য করত।

কাল পরিক্রমায় খৃষ্ট ধর্মেও বহু ভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে। ঈসা আ. এর বিশুদ্ধ তাওহীদ ছেড়ে তারা শিরকে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। কেউ ঈসা আ. কে খোদা বলে। কেউ আল্লাহর পুত্র বলে। আবার কেউ ত্রিত্ববাদের মত দুর্বোধ্য বিশ্বাস সৃষ্টি করে। আর কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত বিধান প্রবর্তন করে পোপরা খৃষ্ট জগতে খোদা সেজে বসে। ফলে প্রকৃত একত্ববাদের বিশ্বাসীর জন্য খৃষ্ট জগতে থাকা অসম্ভব ও বিস্ময়কর বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি তাদের উপর নির্যাতন ও নিপিড়নও চলতে থাকে।

ফাইমুন। খৃষ্ট জগতে একত্ববাদে বিশ্বাসী এক পোপ। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন তাঁর জীবন। ঈসা আ. এর খোদায়িত্ব, ত্রিত্ববাদ ও আল্লাহর পুত্র হওয়ার মিথ্যাচার তিনি বিশ্বাস করেন না। কাফফরার বিধানও মানেন না। তাই খৃষ্ট জগত তাঁর জন্য ছোট হয়ে এল। নানা ভাবে নিপীড়ন চলতে লাগল তাঁর উপর। ফলে খৃষ্ট জগত ত্যাগ করে একটি নিরাপদ জায়গার সন্ধানে তিনি ঘুরতে লাগলেন।

নাজরান। আরবের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জনপদ। মরুর বুকে এক বিশাল সবুজের সমারোহ। ছায়া-ঢাকা পাখি-ডাকা হাজারো প্রকার বৃক্ষে ভরা এ জনপদটি পাদ্রী ফাইমুনের খুব ভাল লাগল। মনের অজান্তে এ জনপদকে ভালবেসে ফেলেন এবং নাজরানেই একটি ছোট্ট কুটির তৈরী থাকেন। নাজরানের অধিকাংশ মানুষ মূর্তিপূজক। বাদশাহও মূর্তিপূজক। কিন্তু পাদ্রী ফাইমুনের তাতে কোন অসুবিধা নেই। নিশ্চিন্তে তিনি তাঁর কুটিরে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকেন।

একদিনের ঘটনা। নাজরানের বাদশাহর নিকট রাজ-যাদুকর এসে বলল, বাদশাহ মহোদয়! জীবনে আপনার বহু খেদমত করেছি। কিন্তু বয়সের ভারে এখন প্রায় অচল হয়ে গেছি। ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে পিঠ। চোখের আলো হয়ে গেছে ঘোলাটে। কখন পরকালের ডাক এসে যায় বলা মুশকিল। তাই

বাদশাহর পদপ্রান্তে আমার নিবেদন, আমাকে একজন মেধাবী, চতুর ও বুদ্ধিমান বালক দিলে আমি তাকে যাদুবিদ্যা শিখিয়ে দিতাম। আমার পর সে-ই রাজ-যাদুকর হিসাবে আপনার খিদমত করত।

আব্দুল্লাহ ইবনে তামের। দারুণ বুদ্ধিমান, চতুর ও মেধাবী বালক। গোটা নাজরানের লোকেরা তার বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ। সুশ্রী, সুন্দর ও চিত্তাকর্ষী চেহারার এ বালকটিকে দেখে, তার কথাবার্তা শুনে সবাই বিমোহিত।

বাদশাহর লোকেরা তাকেই নিয়ে এল। প্রথম নজরেই বাদশাহ তাকে পছন্দ করল। তারপর যাদুকরের হাতে সমর্পণ করল।

সকালে আবদুল্লাহ ইবনে তামের যাদুকরের বাড়িতে যায়। যাদুবিদ্যা শিক্ষা করে। সন্ধায় ফিরে আসে। এভাবে তার দিন কাটতে লাগল। তার যাতায়াত পথে পাদ্রী ফাইমুনের কুটির। প্রত্যহ সে পাদ্রী ফাইমুনকে দেখে। তাঁর নূরানী চেহারা দেখে বিস্মিত হয়। তাঁর কতাবার্তা শুনে ও ইবাদত বন্দেগী দেখে অভিভূত হয়।

পাদ্রী ফাইমুনের ব্যক্তিত্ব তাকে প্রবলভাবে আর্কষণ করে। ফলে আবদুল্লাহ ইবনে তামের যাদুকরের নিকট যাওয়ার সময় কিছু সময় পাদ্রীর নিকট থাকে। তারপর বিলম্ব করে যাদুকরের নিকট যায়। আবার ফেরার পথে কিছু সময় পাদ্রীর নিকট কাটায় এবং বিলম্ব করে বাড়িতে ফিরে। ফলে যাদুকর ও বাড়ির লোকেরা আবদুল্লাহ ইবনে তামেরের উপর ক্ষেপে গেল। তাকে শাস্তি প্রদানেরও উদ্যোগ নিল।

ভীত আবদুল্লাহ ইবনে তামের। কী করবে ভেবে পায় না। পরদিন পাদ্রীর নিকট এসে সবকিছু বললে পাদ্রী বলল, যদি যাদুকর কিছু বলে তাহলে বলবে, বাড়ির লোকদের কারণে আসতে দেরি হয়েছে। আর বাড়ির লোকেরা কিছু বললে বলবে, যাদুকর দেরি করে ছেড়েছে। এভাবে কিছুদিন চলে গেল। পাদ্রীর ঐকান্তিকতায় ও আবদুল্লাহ ইবনে তামের তার অপূর্ব যোগ্যতায় অল্প কয়েক দিনেই বহু কিছু শিখে ফেলল এবং বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যশীল হয়ে গেল।

সিংহ। এক বিরাট সিংহ এসে বসে আছে একেবারে রাস্তার উপর। কী জ্বলজ্বলে তার চোখ! যেন আগুনের গোলক। কেশর ফুলিয়ে যখন তাকায়

গা শিউরে উঠে। হৃদয় ধুক্‌ধুক্‌ করতে থাকে। রাস্তার উভয় পাশে পথচারীদের বিরাট জটলা। আসা যাওয়া বন্ধ। সিংহটিকে দেখার জন্য প্রচুর উৎসাহী মানুষও ভিড় করেছে। আবদুল্লাহ ইবনে তামেরও এ পথেই যাতায়াত করে। সেও এসে দাঁড়াল জনতার ভিড়ে। ইস কী ভয়ংকর এই জানোয়ারটি! যদি মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে কতো জনের প্রাণ যে সংহার করবে তা বলা মুশকিল। তাছাড়া পথচারী লোকদেরও দারুণ কষ্ট হচ্ছে।

শীঘ্রই সিংহটিকে তাড়ানো দরকার। কিন্তু কার এত সাহস! চিন্তা-শক্তির ঘোড়ায় চড়ে আবদুল্লাহ ইবনে তামের অনেক দূর ঘুরে এল। আবারো ছুটাল তার অশান্ত ঘোড়াকে। হঠাৎ থমকে দাড়াল। হ্যাঁ এবার পেয়েছি। এবার আমি যাচাই করব। যাদুকরের ধর্ম ঠিক, না পাদ্রীর ধর্ম ঠিক। এ কথা ভেবেই একটি প্রস্তর খণ্ড হাতে তুলে নিল এবং ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এল। বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেলে জনতার মাঝে হায় হায় রব উঠল। একী! ছেলেটি কি পাগল নাকি। কে পার তাকে ধরে নিয়ে এস। কিন্তু কার এত সাহস। সবাই বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে রইল। সে এক শ্বাসরুদ্ধকর ভয়ংকর পরিস্থিতি।

কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে তামের নির্বিকার। কোন ভয় নেই। কোন আতঙ্ক নেই। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। একেবারে সিংহটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, হে আল্লাহ! হে বিশ্ব চরাচরের মালিক! যদি পাদ্রীর ধর্ম যাদুকরের ধর্মের তুলনায় অধিক সত্য ও সঠিক হয়, তাহলে এ প্রস্তর খণ্ডের আঘাতে সিংহটিকে ধ্বংস করে দাও। এ কথা বলেই আবদুল্লাহ ইবনে তামের সিংহকে লক্ষ করে হাতের পাথরটি ছুঁড়ে মারল।

পাথরের আঘাতে সিংহটি গর্জন করে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল। তার চির স্তব্ধ হয়ে গেল। সমবেত জনতা এ দৃশ্যে হতবাক। হতভম্ব। সবাই হল্লা করে দৌড়ে এসে মৃত সিংহটিকে ঘিরে দাঁড়াল।

এ ফাঁকে আবদুল্লাহ ইবনে তামের গায়েব। নেই নেই নেই। কেউ তাকে খুঁজে পেল না। জনতার ভিড়ে মিশে সোজা পাদ্রীর কুটিরে চলে এল। পাদ্রীকে সব ঘটনা খুলে বলল। সব শুনে পাদ্রীর চেহারায় তৃপ্তি ও আনন্দের

ফকফকে আভা ফুটে উঠল। তারপরই দুশ্চিন্তার কালো রেখা সে আনন্দের আভাকে কিছুটা ফিরে করে তুলল। পাদ্রী বলল, বৎস! তুমি আল্লাহর নিকট আমার চেয়ে অধিক নৈকট্যশীল হয়ে গেছ। আমি আশঙ্কা করছি, শীঘ্রই তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। মনে রাখবে, কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হলে কিন্তু আমার কথা বলে দিবে না।

খ্যাতি! খ্যাতি!! খ্যাতি!!!। আবদুল্লাহ ইবনে তামেরের খ্যাতি নাজরানের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। তার অলৌকিক শক্তির কথা মানুষের মুখে মুখে। ইনিয়ে বিনিয়ে রঙ বেরঙের পত্র পল্লব যোগ করে তার সিংহ হত্যার কাহিনী বর্ণনা চলছে।

অলৌকিক ক্ষমতা-মুগ্ধ মানুষেরা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তার নিকট ছুটে আসতে লাগল। রোগাক্রান্তরা তার দু'আয় ভল হয়ে যায়। জন্মান্ধের চোখ বুলিয়ে দু'আ করলে সাথে সাথে ভাল হয়ে যায়। ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে আলো ঝলমল দুনিয়া দেখতে থাকে। কুষ্ট রোগীর গায়ে পানি পড়ে ছিটিয়ে দিলে দেখতে দেখতে কোমল সুশ্রী চামড়া বিকশিত হয়। তাজ্জব সব ব্যাপার শুরু হয়ে গেল।

রাজ দরবারের এক অন্ধ সভাসদ আবদুল্লাহ ইবনে তামেরের অলৌকিক শক্তির কথা শুনল। আলো ঝলমল এই সুন্দর পৃথিবী দু'চোখ ভরে কে না দেখতে চায়? অন্ধ সভাসদও ছুটে এল আবদুল্লাহ ইবনে তামেরের নিকট। সাথে নিয়ে এল বহু উপহার সামগ্রী। চোখ ভাল করে দেয়ার আবেদন করল।

সভাসদকে দেখেই আবদুল্লাহ ইবনে তামের খানিকটা চিন্তার জগতে হারিয়ে গেল। তারপর বলল, আমি কোন উপহার উপঢৌকনের প্রত্যাশী নই। আপনার চোখে আলো দানের শক্তিও আমার নেই। আল্লাহ্ আমার রব। তিনিই সকল ক্ষমতার উৎস। আপনি তাঁর উপর ঈমান আনলে এবং তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত না করলে আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করব।

আবদুল্লাহ ইবনে তামেরের কথা শুনে সভাসদ মুগ্ধ হল। আল্লাহর উপর ঈমান এনে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করল। আবদুল্লাহ ইবনে তামের দু'আ করল।

সাথে সাথে লোকটির চোখ ভাল হয়ে গেল। সবুজ শ্যামল আলো ঝলমল এই পৃথিবীকে দেখতে পেয়ে যারপর নাই বিমোহিত হল। আবেগে উচ্চাসে অশ্রু ছলছল হয়ে উঠল তার চোখে।

পরদিন রাজপ্রাসাদে দরবার বসল। সভাসদরা একে একে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করল। অন্ধ সভাসদটি আজ আর অন্ধ নয়। তাই বাদশাহকে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দে এগিয়ে গিয়ে নিজ আসন গ্রহণ করল। অন্ধ সভাসদকে চক্ষুষ্মান দেখে বাদশাহ বিস্ময়ের দোলায় দোল খেতে খেতে বলল, আরে! তুমি না অন্ধ? আজ হঠাৎ করে দৃষ্টি শক্তি পেলে কোত্থেকে?

সভাসদ বলল, আমার রব আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। আমাকে এই সুন্দর পৃথিবী অবলোকনের তাওফীক দিয়েছেন।

বাদশাহর কণ্ঠে বিস্ময়। বলল, তোমার রব! এ আবার কেমন কথা বলছ? আমি ছাড়া তোমার আবার রব আছে নাকি?

সভাসদের কণ্ঠ অত্যন্ত দৃঢ়। বলল, আমার, আপনার ও সমগ্র বিশ্বের রব আমাকে আরোগ্য দান করেছেন।

সভাসদের কথায় বাদশাহ ক্রোধে ক্রোধে আগুন। চিৎকার করে উঠল। নরাধম! আমি ছাড়া আবার তোর রব কে আছে রে? সভাসদের কণ্ঠ অত্যন্ত শান্ত ও দৃঢ়। বলল, হ্যাঁ আছেন। তিনি আল্লাহ। তিনি আমার রব। আপনার রব। তিনিই ঐ নীল আকাশ, এ মনেরাম পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের রব। আমাদের সকলের মালিক।

বাদশাহ অগ্নিশর্মা। চিৎকার করে ধমকে উঠল। কী এতো বড় সাহস তোর! আমার খেয়ে আমার নাফরমানি! এতো নিমকহারাম তুই! এ নিমকহারামীর শাস্তি তোকে অবশ্যই পেতে হবে।

অগ্নিপরীক্ষা। হ্যাঁ, অগ্নিপরিক্ষার সম্মুখীন হল সভাসদ। শাস্তির পর শাস্তি চলতে লাগল। দিনের পর দিন শাস্তির মাত্রা বেড়েই চলল। কিন্তু সভাসদ তার ঈমানে অটল। ইস্পাত কঠিন তার মনোবল।

এক কথা তার। আল্লাহ ছাড়া তার আর কোন রব নেই। কোন উপাস্য নেই। এদিকে শাস্তিরও কোন শেষ নেই। অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে আবদুল্লাহ

ইবনে তামেরের অলৌকিক কাহিনীর কথা বলে দিল।

এবার আবদুল্লাহ ইবনে তামেরের গ্রেফতারী পরোয়ানা নিয়ে বাদশাহর লোক লস্কর ছুটল চারদিকে। ধরে আনল আবদুল্লাহ ইবনে তামেরকে।

বাদশাহর কণ্ঠে ঝড়ের পূর্বাভাস। বলল, বৎস! শুনতে পেলাম যাদুবিদ্যা বলে তুমি অন্ধের চোখে আলো দিচ্ছ আর কুষ্ঠ রোগীকেও আরোগ্য করছ?

আবদুল্লাহ ইবনে তামের বলল, বাদশাহ নামদার! আমার তো সে ক্ষমতা নেই। আল্লাহ আমার রব। তিনিই সকল ক্ষমতার মালিক। তিনিই আরোগ্য দান করেন। অন্ধের চোখে আলো দেন। কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করেন।

বাদশাহর কণ্ঠে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল। বলল আমি ছাড়া কি তোমার রব আছে?

আবদুল্লাহ ইবনে তামের অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলল, হ্যাঁ আছেন। আল্লাহই আমার রব। তিনি শক্তির আধার। তিনিই আরাগ্যদাতা।

অগ্নিপরীক্ষা। আবদুল্লাহ ইবনে তামেরের উপরও অগ্নিপরীক্ষা নেমে এল। শাস্তির পর শাস্তি চলতে থাকল। এক ধরনের শাস্তির ভয়াবহতা হৃদয় থেকে মুছে যেতে না যেতেই আরেক ধরনের ভয়াবহ শাস্তি শুরু হয়ে যায়। সকালে এক ধরনের শাস্তি, সন্ধ্যায় আরেক ধরনের শাস্তি। রাত ও দিনের বির্বতনে শাস্তির মাত্রা ও পদ্ধতিও বেড়ে চলল। নিরুপায় হয়ে উঠল আবদুল্লাহ ইবনে তামের। অবশেষে পাদ্রীর কথা বলে দিল।

ছুটল বাদশাহর লোক লস্কর। গ্রেফতার করে আনল পাদ্রী ফাইমুনকে। বাদশাহ তাঁকে ধর্ম ত্যাগের নির্দেশ দিল। কিন্তু পাদ্রী ফাইমুন অটল অবিচল। ক্ষণস্থায়ী এই স্বপ্নময় দুনিয়ার সাময়িক সুখের জন্য পরকালের জীবনকে ধ্বংস করতে সে রাজি নয়।

বাদশাহর ক্রোধ, ধমকি, হুমকি কোনই কাজে আসল না। সব ভেস্তে গেল। পাদ্রী কিছুতেই তাঁর ধর্ম ত্যাগ করল না। সবশেষে বাদশাহর নির্দেশে করাত দিয়ে মাথা দ্বিখণ্ডিত করে তাকে শহীদ করা হল। এভাবে সভাসদকেও শহীদ করা হল।

এবার আবদুল্লাহ ইবনে তামেরর পালা। তার কী শাস্তি হবে? বাদশাহ

অনেক ভেবে চিন্তে বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে বলল, যাও! নরাধমকে নিয়ে যাও। পর্বতের উচুঁ চূড়া থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা কর।

বাদশাহর লোক লস্কর আবদুল্লাহ ইবনে তামেরকে নিয়ে অদূরের এক পর্বতের উচুঁ চূড়ায় উঠল। এবার নিক্ষেপের পালা। আবদুল্লাহ ইবনে তামের তখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ! আমাকে রক্ষা করুন এবং আপনিই আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

আবদুল্লাহ ইবনে তামেরের দু'আ শেষ হতে না হতেই পর্বতের চূড়ায় প্রবল কম্পন শুরু হল। বাদশাহর লোক লস্কর পর্বত চূড়া থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ে নিহত হল। আবদুল্লাহ ইবনে তামেরের কিছুই হল না। নিরাপদে সে ফিরে এল।

আবদুল্লাহ ইবনে তামেরকে দেখে বাদশাহ বিস্মিত হয়ে বলল, তোমার সাথে যে লোক লস্কর গিয়েছিল তারা কোথায়?

আবদুল্লাহ ইবনে তামের বলল, আমার আল্লাহ আমাকে সাহয্য করেছেন। ফলে তারা পর্বতের চূড়া থেকে গড়িয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

বাদশাহ ক্রোধে অধীর। পশুর মত হুঙ্কার দিয়ে বলল, কে কোথায় আছিস ছুটে আয়। এই পাপিষ্ঠ নরাধমকে আমার সম্মুখ থেকে নিয়ে যা। নদীর পানিতে ডুবিয়ে মার।

সাথে সাথে ছুটে এল বাদশাহর লোক লস্কর। হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল আবদুল্লাহ ইবনে তামেরকে। পানিতে ডুবিয়ে মারার জন্য যখন তারা নদীর মধ্যস্থলে পৌছল এবং আবদুল্লাহ ইবনে তামেরকে ফেলে দেয়ার কার্যক্রম শুরু করল।

আবদুল্লাহ ইবনে তামের তখন আল্লাহর নিকট দুআ করল। হে আল্লাহ! আমাকে রক্ষা করুন এবং এদের মোকাবেলায় আপনিই আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। দু'আ শেষ হতে না হতেই নদীর পানি ফুঁসে উল। প্রমত্ত নদীর ঢেউয়ের কবলে পড়ে নৌকাটি উল্টে গেল। বাদশাহর লোক লস্কর পানিতে নিমজ্জিত হল। তাদের সলীল সমাধি ঘটল আর আবদুল্লাহ ইবনে তামের নিরাপদে ফিরে এল।

বাদশাহ তাকে সুস্থ নিরাপদ থেকে বিস্ময়েবিমূঢ়। এ কী তুমি এখানে! তোমার সাথে যারা গিয়েছিল তারা কোথায়?

আবদুল্লাহ ইবনে তামের বলল, আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন আর তারা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।

এ কথা শুনে বাদশাহ প্রায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে চিৎকার করতে লাগল। আবদুল্লাহ ইবনে তামের তখন বলল, বাদশাহ নামদার! আপনি আমাকে যেভাবে হত্যা করতে চাচ্ছেন তাতে কখনো সফল হবেন না। যদি আমাকে একান্তই হত্যা করতে চান তাহলে আমার কথামত কাজ করতে হবে।

বাদশাহ বলল, কী তোমার সেই কথা।

আবদুল্লাহ ইবনে তামের বলল, আমাকে মারতে হলে নাজরানের সকল মানুষকে একটি খোলা প্রান্তরে জমায়েত করতে হবে। তারপর আমাকে শূলিকাষ্ঠে চড়িয়ে আমার তূনীর থেকে তীর নিয়ে নিক্ষেপ করতে হবে। তীর নিক্ষেপের পূর্বে বলতে হবে–

بِاسْمِ اللّٰهِ رَبِّ هٰذَا الْغُلَامِ

'ঐ আল্লাহর নামে তীর নিক্ষেপ করছি যিনি এই বালকের রব।'

তা হলেই আপনি আমাকে হত্যা করতে পারবেন।

এদিকে আবদুল্লাহ ইবনে তামেরের অলৌকিক শক্তির কথা নাজরানের ঘরে ঘরে আলোচিত হচ্ছে। সবাই বাদশাহর নির্যাতন ও নিপীড়নের কথা শুনে বেদনার্ত। দুঃখ ভারাক্রান্ত। সবাই তার মুক্তির দু'আ করছে। তার জন্য নীরবে নির্জনে কাঁদছে।

ঢং ঢং ঢং রাজ- ঘোষকের ঘণ্টার আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল। তারপরই উচ্চ কণ্ঠে বিঘোষিত হল– 'নাজরানের মহামান্য রাজার নির্দেশ, অমুক প্রান্তরে রাজ-নাফরমান আবদুল্লাহ ইবনে তামেরকে শূলিকাষ্ঠে চড়িয়ে হত্যা করা হবে। সবাই সেখানে উপস্থিত হতে হবে। কেউ রাজাজ্ঞা অমান্য করলে

কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।' নাজরানের অলিতে গলিতে সর্বত্র এ ঘোষণা প্রচার করা হল।

এ ঘোষণা শোনার পর হতে নাজরানের অধিবাসীদের অন্তরে একটা চাপা বেদনা উথাল পাতাল শুরু করল। আবদুল্লাহ ইবনে তামেরের জন্য সবার হৃদয়ে হু হু করে কান্নার সাইমুম বইতে লাগল। একটা আক্ষেপ, একটা যন্ত্রণা সারাক্ষণ তাদের অন্তরে মাথা কুটছে। রক্তাক্ত করছে। কিন্তু কারো টু শব্দ করার অধিকার নেই। করলেই নির্ঘাত মৃত্যু।

নির্দিষ্ট সময়ে প্রান্তরটি লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। নারী পুরুষ আবাল বৃদ্ধ বণিতা সবাই উপস্থিত। অলৌকিক শক্তির অধিকারী এ বালকটিকে বাদশাহ পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে এবং নদীর পানিতে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি। বরং যারা হত্যা করতে গিয়েছিল তারাই নিহত হয়েছে। আল্লাহ মালুম এবার কী ঘটে। দর্শকদের হৃদয় বেদনার্ত হলেও একটা অলৌকিক কিছু ঘটার ও দেখার সম্ভাবনায় তাদের চোখ দারুণ উৎসুক। হৃদয় সীমাহীন অনুসন্ধিৎসু।

বাদশাহ ও তার লোকজন এল। আবদুল্লাহ ইবনে তামেরকে নিয়ে এল। শূলিকাষ্ঠের একেবারে নিকট নিয়ে গেল। কিন্তু তার চেহারায় কোন বিকার নেই। চিন্তার কোন লেশ নেই। নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় সে শূলিকাষ্ঠের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর তাকে শূলিকাষ্ঠে চড়িয়ে দেয়া হল এবং তার তূণীর হতে একটি তীর নিয়ে জনৈক তীরন্দাজ চিৎকার করে বলল–

بِاسْمِ اللهِ رَبِّ هٰذَا الْغُلَامِ

'এই বালকের রবের নামে আমি তীর নিক্ষেপ করলাম।'

তারপর তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করল। সাঁ করে তীরটি আবদুল্লাহ ইবনে তামেরের কর্ণমূলে বিদ্ধ হল। ছটফট করতে করতে শহীদ হয়ে গেল আবদুল্লাহ ইবনে তামের।

এ নির্যাতন, এ নিপীড়ন আল্লাহ সহ্য করলেন না। সাথে সাথে আযাব এসে বাদশাহ ও তার লোক লস্করকে ধ্বংস করে দিল।

উপস্থিত জনতার হৃদয়চক্ষু এতক্ষণে খুলে গেছে। অন্তরের গলি পথ দিয়ে

সকল অন্ধকার ও আবিলতা নিমিষে দূর হয়ে গেছে। উচ্চ কণ্ঠে সবাই বলে উঠল–

اٰمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ

'আমরা সবাই এই বালকের রবের প্রতি ঈমান আনলাম।'

সাথে সাথে তারা খৃষ্ঠ ধর্ম অবলম্বন করল। ঈসা আ. এর উপর ঈমান আনল। ইঞ্জিলের বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে লাগল। নাজরানের ঘরে ঘরে তাওহীদের শিক্ষা শুরু হয়ে গেল। নূরের দীপ্তিতে এখন নাজরানের আকাশ বাতাস আলোকিত। দীপ্তিময়। দ্বীপান্বিত।

ইয়ামেন। নাজরানের নিকটবর্তী দেশ। ইউসূফ যূনাওয়াস এ দেশের বাদশাহ। অত্যন্ত প্রভাব প্রতিপত্তি ও প্রতাপশালী বাদশাহ। ইহুদীবাদে বিশ্বাসী এ বাদশাহ ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত গোঁড়া। তদুপরি পাষাণ ও কঠিন হৃদয়ের অধিকারী। ভিন্ন ধর্মের কাউকে সুনজরে দেখে না। নির্যাতন নিপীড়ন করে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে ইহুদী বানায়। খৃষ্ট ধমের নাম শুনলেই তার গা রি রি করে উঠে। গায়ে আগুন ধরে যায়।

একদিন বিকালে চারদিকে ফুরফুরে বাতাস বইছে। গোটা প্রকৃতি আমোদিত। ফুলের গন্ধে চারদিক সুবাসিত। বাদশাহ যূনাওয়াস তার রাজত্বের উচ্চ পদস্থ লোকদের নিয়ে খোশ গল্পে লিপ্ত। আলাপ আলোচনা করছে। শলাপরামর্শ করছে। কথার পিঠে কথা চলছে। ইতিমধ্যে এক প্রহরী এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল। বলল, বাদশাহ নামদার! এক ব্যক্তি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। মনে হয় দূরের কোথাও থেকে এসেছে। বলছে, অত্যন্ত জরুরী সংবাদ নিয়ে এসেছি। এখনই বাদশাহর সাথে দেখা করতে হবে। বাদশাহ বলল, যাও, লোকটিকে নিয়ে এস।

প্রহরী লোকটিকে নিয়ে এল। লোকটি কুর্নিশ করে বলল, বাদশাহ মহোদয়! আমি নাজরানের অধিবাসী। আমি ইহুদী। কিন্তু হঠাৎ করে এক বালকের অলৌকিক কিছু ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে নাজরানের সকল মানুষ খৃষ্টান হয়ে গেছে। আমরা যারা ইহুদী আছি আমাদের আর নাজরানে থাকার কোন উপায় নেই। সুতরাং হে ইয়ামেনের অধিপতি! আপনি আসুন, নাজরানের মানুষগুলোকে ইহুদী ধর্মাবলম্বী বানান। এ পূণ্যময় দায়িত্ব

আপনাকেই পালন করতে হবে। অন্যথায় দেখবেন, একদিন ইয়ামেনও খৃষ্টানদের দাপটে অস্থির হয়ে পড়বে। আপনার ক্ষমতা টলটলায়মান হয়ে উঠবে।

বাদশাহ যূনাওয়াস বেশ কিছুদিন যাবত লক্ষ্য করছে, নাজরানে রোমান বণিকরা পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসা যাওয়া করছে। বাণিজ্যের অন্তরালে ধর্মের প্রচারও তারা চালিয়ে যাচ্ছে। ইয়ামেনের নাকের ডগায় এসে খৃষ্টানদের এ আচরণ, এ দৌরাত্ম্য কিছুতেই সে সহ্য করতে পারছিল না। তাই এর একটা বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা চিন্তা ভাবনা করছিল।

এ ঘটনা শোনার পর আর বিলম্ব করা সমীচীন মনে করল না। সাথে সাথে তার বাহিনীকে প্রস্তুতির নির্দেশ দিল। পরদিন সকালে ইয়ামেনের অধিবাসীরা দেখল, বাদশাহ যূনাওয়াস বিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে রওয়ানা হয়েছে। মরুর ধুলি উড়িয়ে, পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে ধ্বনি তুলে ছুটে চলছে তার বিশাল বাহিনী। নাজরানের দিকে তীর বেগে তারা ছুটে যাচ্ছে। শান্ত নাজরানের আকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা। অথচ নাজরানের লোকেরা কিছুই জানে না। একেবারে অপ্রস্তুত। হঠাৎ মার মার কাট কাট করে ইয়ামেনের সৈন্যরা নাজরান ঘিরে ফেলল। চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। ভয়ে যে যার ঘরে আশ্রয় নিল। নাজরানের পথে পথে ইয়ামেনের সশস্ত্র সৈন্যরা অবস্থান গ্রহণ করল।

নাজরান পদানত করার পর বাদশাহ যূনাওয়াস নেতৃস্থানীয় লোকদের ডাকল। বলল, আমি বাদশাহ ইউসূফ যূনাওয়াস। আমার শক্তি ক্ষমতার কথা তোমরা জান। আমি যে কত নিষ্ঠুর ও পাষাণ হতে পারি তাও তোমাদের অজানা নয়। আমি তোমাদের নির্বিচারে হত্যা করতে চাই না। আমরা শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে হলে তোমাদের অবশ্যই ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। খৃষ্ট ধর্ম ত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় মৃত্যুই হবে তোমাদের পুরস্কার। এরপর আর কিছুই আমি শুনতে চাই না।

নাজরানের নেতৃস্থানীয় লোকেরা ও সাধারণ জনগণ বাদশাহ যূনাওয়াসের কথা শুনল। অত্যন্ত ঘৃণাভরে তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। বলল, যে ধর্মের বিমল আলোয় আমাদের অন্ধকার হৃদয় উদ্ভাসিত হয়েছে, যে সত্যের

ছোঁয়ায় আমাদের অন্তর দীপ্তিময় হয়েছে আমরা কিছুতেই তা ত্যাগ করতে পারব না। এবার তোমার যা করার করতে পার।

কী এত বড় সাহস! এত বড় স্পর্ধা! ক্রোধে ক্রোধে উন্মাদ যূনাওয়াস যেন সাক্ষাৎ পশু। দাঁতে দাঁত পিষে তার বাহিনীকে বলল, প্রত্যেকে অলিতে গলিতে গর্ত করে তাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর। তারপর যেই খৃষ্ট ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকার করবে তাকেই তাতে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দাও।

নাজরানের রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিরাট বিরাট গর্ত করে তা ইন্ধনে পরিপূর্ণ করা হল। তারপর আগুন ধরিয়ে দেয়া হল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। লেলিহান অগ্নিশিখার লকলকে জিহ্বা যেন আকাশকে গ্রাস করতে উপরে উঠতে লাগল। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। সে এক লোমহর্ষক পরিস্থিতি।

তারপর বাদশাহ যূনাওয়াসের বাহিনী ঘরে ঘরে ঢুকে খৃষ্টান নারী পুরুষদের নির্দয়ভাবে টেনে হিঁচড়ে এনে আগুনে নিক্ষেপ করতে লাগল। বাদশাহ যূনাওয়াসের নির্দেশে কাউকে ক্ষমা করা হল না। সবাইকে নির্মমভাবে আগুনে পুড়িয়ে মারা হল। আর বাদশাহ যূনাওয়াস ও তার সঙ্গী সাথীরা অত্যন্ত আত্মতৃপ্তির সাথে তা অবলোকন করল।

ঠিক তখন এক মহিলাকে ধরে আনা হল। তার অপরাধ, সে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাই তাকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হবে। মহিলার কোলে এক ফুটফুটে শিশু। মায়ের কোল আলোকিত করে শিশুটি মিটিমিটি হাসছে।

সামনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। অগ্নিতাপে সামনে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। আগুনের লকলকে জিহ্বা গ্রাস করতে এগিয়ে আসে। আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে মহিলার অন্তরে ভাবান্তর সৃষ্টি হল। একবার আগুনের দিকে তাকায়। আরেকবার শিশুটির বিমল মুখের দিকে তাকায়। দোদুল্যমান অবস্থা। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আলো-আঁধার, আর সত্য-মিথ্যার মাঝে দাঁড়িয়ে মাতৃ-হৃদয় দিশেহারা।

ঠিক তখন আল্লাহ অবুঝ শিশুটিকে বাকশক্তি দান করলেন। মিষ্টি কণ্ঠে সে বলে উঠল, আম্মু! ভয় নেই। সত্যের পথে অবিচল থাকুন। এ আগুনের

পশ্চাতেই রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর সুখদ নেয়ামত।

শিশুর এ কথা শুনে মহিলার চেতনা ফিরে এল। কম্পমান ঈমান নিস্কম্প ও দৃঢ় হয়ে গেল। স্বপ্নময় এ দুনিয়ার হাতছানিকে উপেক্ষা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের পথে দৃঢ় পদে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পেল। ঝাঁপিয়ে পড়ল লেলিহান আগুনে। ইহকালকে পশ্চাতে ফেলে পরকালের কামিয়াবীর পথে হারিয়ে গেল।

বিশ হাজার খৃষ্টানকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে বাদশাহ যূনাওয়াস নাজরানকে খৃষ্টান মুক্ত করল। ইহুদীরা তাদের বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পদ, জমিজমা দখল করে নিল। নাজরানে খৃষ্টানদের আর কোন চিহ্নই রইল না। উখদূদ বাসীর ঘটনা ও বর্ণনার ইঙ্গিত রয়েছে পবিত্র কুরআনের ত্রিশতম পারার সূরা বুরুজে।

আস্‌হাবুল ফীল*

দূস ইবনে তাগ্‌লিয়ান। নাজরানের এক প্রভাবশালী গোত্রের সর্দার। যেমন চালাক চতুর তেমন চৌকান্না। গোটা নাজরানে তার কোন তুলনা নেই। যূনাওয়াসের নির্দয় সৈন্যরা যখন হিড়হিড় করে নাজরানের খৃষ্টান অধিবাসীদের টেনে এনে আগুনে পুড়িয়ে মারতে লাগল, তখন দূস সৈন্যদের কঠোর প্রহরা গলিয়ে পালাল।

তীর তীব্র গতিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল তার ঘোড়া। ধূলিঝড় তুলে অনন্ত মরুর বুকে হারিয়ে গেল। যূনাওয়াসের সৈন্যরা পশ্চাদ্ধাবন করলেও তার পাত্তা পেল না। সৈন্যদের মনে হল, চোখের সামনে ধুলিঝড় উড়িয়ে মরুর বায়ুর সাথে যেন মিশে গেছে দূস। ফলে নিরাশ হয়ে তারা ফিরে এল।

দূস এখন কোথায় যাবে? জীবনের সবকিছু তার যূনাওয়াসের আগুন গ্রাস করে নিয়েছে। ঘরবাড়ি, আত্মীয়স্বজন, ছেলেমেয়ে ও পুঞ্জীভূত ধন-সম্পদ কিছুই তার নেই। সব শেষ হয়ে গেছে। কোথায় যাবে? কে তাকে আশ্রয় দেবে? হতাশার অন্ধকারে হাতড়ে ফিরতে লাগল। ভাবনার দোলায় দোল

* আসহাবুল ফীল : অর্থ হাতীওয়ালাগণ। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের আনুমানিক দু'মাস পূর্বে ইয়ামেনের গভর্নর আবরাহা কাবা ধ্বংসের জন্য এক অভিযান পরিচালনা করেছিল। এ অভিযানে ইয়ামেন থেকে বিশালকায় হাতীও নিয়ে এসেছিল। তাই তাদের 'আসহাবুল ফীল' বলা হয়। মক্কার অদূরে ওয়াদীয়ে মুহাস্‌সাবে আবাবীল পাখির আক্রমণে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

খেতে লাগল। ভাবতে ভাবতে অনেক দূর চলে এল। মাঝে মাঝে মনটা তার বিদ্রোহী হয়ে উঠে। হঠাৎ তার মনটা একেবারে বেঁকে বসল। প্রতিশোধ-স্পৃহায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ভাবল– না, দিশেহারা হয়ে উদ্ভ্রান্তের মত পথে পথে ঘুরলে হবে না। প্রতিশোধ নিতেই হবে। যূনাওয়াসকে হত্যা করেই এ আত্মা শান্ত হবে। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? যূনাওয়াসের বিশাল বাহিনী আছে। ক্ষমতা, অর্থ-সম্পদ সবই আছে। কিন্তু আমার তো কিছুই নেই। আমি জনহীন, বলহীন, কপর্দকশূন্য।

চাপা চাপা অন্ধকার ভেদ করে দূসের চিন্তা শক্তি হঠাৎ এক আলোক রশ্মিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। হ্যাঁ, এই পাপিষ্ঠ নরাধম যূনাওয়াসের বিরুদ্ধে খৃষ্টান সম্রাট কাইসারের সাহায্য নিতে হবে। তাকেই শোনাতে হবে এই মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক কাহিনী। তিনি পারেন এ নরাধমকে শায়েস্তা করতে। এ পাপিষ্ঠ থেকে প্রতিশোধ নিতে।

দূসের ঘোড়া এবার শামের দিকে ছুটতে লাগল। বহু কষ্টে, নানা বাধা অতিক্রম করে, বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে অবশেষে দূস রোম সম্রাট কাইসারের দরবারে উপস্থিত হল। দরবারে তখন উজির নাজির, সেনাপতি, সভাসদবর্গ সবাই উপস্থিত। দূস কেঁদে কেঁদে আকুল হয়ে যূনাওয়াসের নির্মম নির্যাতনের কাহিনী শোনাল। গোটা দরবার কক্ষে তখন কবরের নিরবতা। হৃদয় বেদনার্ত। চোখ অশ্রু বিজড়িত। রোম সম্রাট হুঙ্কার দিয়ে উঠল। কী... অসহায় মানুষগুলোর প্রতি এতো নির্যাতন! এতো নিপীড়ন! ইহুদী যূনাওয়াসকে আর দুনিয়ার বুকে থাকতে দেয়া যায় না। সম্রাট প্রতিজ্ঞা করল, যেভাবেই হোক যূনাওয়াসকে অবশ্যই শায়েস্তা করতে হবে। ইহুদীদের দেখিয়ে দিতে হবে, খৃষ্টানদের গায়ে হাত দিলে কী শাস্তি পেতে হয়।

পরামর্শ সভা বসল। সবাই একমত, যূনাওয়াসকে ক্ষমা করা যায় না। কিন্তু কিভাবে শাস্তি দিতে হবে? উজির নাজির আর সেনাপ্রধান বলল, রোম সাম্রাজ্য থেকে ইয়ামেন অনেক দূরে। এখান থেকে সৈন্য পাঠিয়ে তেমন সুবিধে হবে না।

সম্রাট প্রশ্ন করল, তাহলে কী করতে হবে? একজন বলল, মহামান্য সম্রাট! আবেসিনিয়ার বাদশাহ খৃষ্টান। আমাদের ধর্মাবলম্বী। তাছাড়া ইয়ামেন আবেসিনিয়ার অতি নিকটবর্তী দেশ। যূনাওয়াসের বিরুদ্ধে আবেসিনিয়ার

বাদশাহ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। প্রয়োজনে আমরা সাহায্য সহযোগিতা করব।

সম্রাটের মাথা দুলে উঠল। আনন্দের আভা ফুটে উঠল তার চেহারায়। বলল, উত্তম প্রস্তাব। তাই করা হোক। আজই আবেসিনিয়ার বাদশাহের নিকট পত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক।

দূসের ঘোড়া আবেসিনিয়ার পথে ছুটে চলছে। যেন উড়ে উড়ে ছুটছে। রোম সম্রাটের পত্র নিয়ে যাচ্ছে আবেসিনিয়ার বাদশাহর নিকট। হৃদয়-আকাশে খুশির পায়রাগুলো শুধুই ডিগবাজি খাচ্ছে। এবার যূনাওয়াসকে মজা দেখাব। কার গায়ে হাত দেয়া। আমরা খৃষ্টান। ঈসা আ. এর অনুসারী। আমাদের উপর নিপীড়ন নির্যাতন। এবার তোকে মজা দেখাব। ইয়ামেনের মাটি তোর নাপাক রক্তে রঞ্জিত করব। ইয়ামেনকে বানাব খৃষ্ট ধর্মের প্রাণকেন্দ্র। বন-জঙ্গল, মাঠ-ঘাট, আর বিজন মরু বিয়াবান পেরিয়ে ছুটে চলছে দূসের ঘোড়া। ছুটতে ছুটতে আবেসিনিয়ার সীমান্তে পৌছল।

বাদশাহ নাজ্জাসী। সত্যের সন্ধানী। নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের বন্ধু। ন্যায় ও আদর্শের ধ্বজাধারী। আবেসিনিয়ার প্রজারা তাই তাকে মনে প্রাণে ভালোবাসে। শ্রদ্ধা করে। তার নির্দেশে অকুণ্ঠ চিত্তে জীবন বিসর্জন দেয়। গোটা দেশ তাই সুখে ভরপুর। কারো চেহারায় বিষাদ-বেদনার কোন চিহ্ন নেই।

দূস নাজ্জাসীর দেশে পা রেখেই বিমোহিত হল। সবার মাঝে এক স্বর্গীয় সুখের অনুভূতি। ইবাদতের সময় গির্জায় গির্জায় ঘন্টার আওয়াজ ঢং ঢং করে বেজে উঠে। সবাই প্রশান্ত চিত্তে গির্জায় ছুটে যায়। ভারী চমৎকার লাগল দেশটা।

নাজ্জাশী বসে আছে। কারুকার্য খচিত, মুক্তা মানিক্য বিজড়িত তার সিংহাসন। রাজপ্রহরী এসে পদধূলি নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। নাজ্জাসীর অনুমতি পেলেই কি যেন বলবে।

নাজ্জাসীর ইঙ্গিতে তার ওষ্ঠাধর কেঁপে উঠল। বিনীত কণ্ঠে বলল, বাদশাহ নামদার! রোম সম্রাট কাইসারের চিঠি নিয়ে জনৈক আরব হাজির। আপনার দর্শন ও সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছে।

বিস্ময় ঝরে পড়ল নাজ্জাসীর কণ্ঠ চিরে। কী বললে! রোম সম্রাটের চিঠি!

নাজ্জাসীর যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না।

রাজপ্রহরী বলল, হ্যাঁ মহারাজ! রোম সম্রাটের চিঠি।

নাজ্জাসী বলল, যাও, নিয়ে এস।

রাজপ্রহরীর সাথে দূস নাজ্জাসীর সামনে উপস্থিত হয়ে রোম সম্রাটের চিঠি হস্তান্তর করল। চিঠি নিয়েই মেলে ধরল চোখের সামনে। দেরি যেন সইছে না। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তা পড়ছে। নাজ্জাসীর উজ্জ্বল চেহারা মাঝে মাঝে বিবর্ণ আকার ধারন করছে। চোখের কোণে জমায়েত হয়েছে বিন্দু বিন্দু অশ্রু। পাঠ শেষে দূসের দিকে তাকিয়ে বলল, সত্যই কি যূনাওয়াস এই পাশবিক আচরণ করেছে।

আবেগাপ্লুত দূসের হৃদয়। রোরুদ্য কান্না উথলে উঠল কণ্ঠে। বিজড়িত হৃদয়বিদারক ভাষায় দূস যূনাওয়াসের নির্যাতনের বিবরণ দিতে দিতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। মজলিসে উপস্থিত সবার হৃদয় বিগলিত হল। বিষাদে বিষাদে ভরে গেল তাদের হৃদয়-কন্দরগুলো। বাদশাহ নাজ্জাসীর চেহারায় একটা কাঠিন্য ভাব ফুটে উঠল। দোল খাওয়া ডালের মত তার মাথাটির দুলে উঠল। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। যূনাওয়াসের অহংকারকে ধূলিস্মাৎ না করে, নির্মম এ নির্যাতনের প্রতিশোধ না নিয়ে আর শান্তি নেই। আর স্বস্তি নেই।

গম্ভীর কণ্ঠে দূসকে বলল, কোন চিন্তা করো না। যূনাওয়াসের এতো সাহস! এতো অহংকার!! এতো স্পর্ধা!!! এ ধরায় আর তাকে থাকতে দিব না।

নাজ্জাসীর সেনাবাহিনীতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। চারদিকে সাজ সাজ রব। অস্ত্রাগার থেকে ঢাল-তরবারী, তীর-তূনীর, বর্শা-শিরস্ত্রান সব কিছুই সৈন্যদের মাঝে বিতরণ করা হল। বহু স্বেচ্ছাসেবী যোদ্ধাও এসে বাহিনীতে যোগ দিল। আবেসিনিয়ার এক খোলা প্রশস্ত প্রান্তরে এ বিশাল বাহিনী সমবেত হল। সত্তর হাজার ছাড়িয়ে যাবে তার সৈন্য সংখ্যা।

আরবাত। কোমলে-কঠোর গড়া তার চরিত্র মাধুর্যে বাদশাহ নাজ্জাসী মুগ্ধ। সেনাবাহিনীর প্রত্যেকটি সৈন্য মুগ্ধ। মুগ্ধ আবেসিনিয়ার আপামর জনগণ। তাই তাকেই বাদশাহ নাজ্জাশী এ বিশাল বাহিনীর সেনাপতি নির্বাচন করল। সাথে রইল বহু নাম করা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। সমর নায়ক। যুদ্ধবিশারদ। অতঃপর ধুলিঝড় উড়িয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে আবেসিনিয়ার বাহিনী

ছুটে চলল ইয়ামেনের পথে। যতদ্রুত সম্ভব ইয়ামেনে পৌছতে হবে। শত্রু পক্ষকে অজ্ঞাত রেখে ইয়ামেন দখল করে নিতে হবে। আকস্মিক ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সান'আর উপর।

ইয়ামেনের আকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা। কিন্তু ইয়ামেনের খবর নেই। অহংকারী যূনাওয়াস ভোগ বিলাসে মত্ত। সেনাপতি আরবাতের নেতৃত্বে আবেসিনিয়ার বাহিনী হঠাৎ এসে ইয়ামেনের রাজধানী সান'আয় ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে বিশাল এলাকা দখল করে নিল। যূনাওয়াস যখন সংবাদ পেল, তখন তার করার মত তেমন কিছুই রইল না। তবুও সে পিছ পা হল না। সেও তার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এল। উভয় বাহিনী মুখোমুখি। খৃষ্টান ধর্মের ধ্বজাধারী এক বাহিনী। ইহুদী ধর্ম বিশ্বাসের ধ্বজাধারী আরেক বাহিনী। উভয় বাহিনী খুনের নেশায় পাগলপারা। উভয় বাহিনী তেড়ে এল। হল সংঘর্ষ। তারপর শুরু হল যুদ্ধ। ভীষণ যুদ্ধ। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। রক্তক্ষয়ী সে যুদ্ধ। তলোয়ারে তলোয়ারে, বর্শায়-বর্শায় আর তীরে তীরে যুদ্ধ শুরু হল। প্রাণ দেয়া নেয়ার খেলায় মেতে উঠল উভয় বাহিনী। রক্তে রক্তে লালে লাল হয়ে গেল রণাঙ্গন। এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লাশ আর লাশ। আহতদের আর্ত চিৎকারে ও গোঙ্গানীতে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে এল। আহত ও উদ্ভ্রান্ত ঘোড়ার হ্রেষারব পরিবেশকে আরো ভয়াবহ করে তুলল।

আরবাতের দক্ষ নেতৃত্বে আবেসিনিয়ার সৈন্যদের যুদ্ধ স্পৃহা সময়ের তালে তালে বেড়েই চলল। অফুরন্ত শক্তি আর সাহসে তারা আজ মারমুখী। বেপরোয়া। ক্ষুধিত শার্দুল। যাকেই সামনে পাচ্ছে মুহূর্তে ধরাশায়ী করে আরেক জনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

ভীরুতা। চরম ভীরুতা আর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল যূনাওয়াসের বাহিনীতে। তারপরই পালাও পালাও রব উঠল। কে কার আগে পালাবে এবার তারই প্রতিযোগিতা শুরু হল। হাজার হাজার লাশ ফেলে যূনওয়াসের বাহিনী পালাতে লাগল।

যূনাওয়াসের মাথায় দুশ্চিন্তার আনাগোনা। ভাবছে, ভাগ্যের খেলায় আমি আজ পরাজিত। শুধু পরাজিতই নই। কিছুক্ষণ পরই এগিয়ে আসবে মৃত্যুর

হীম শীতল ভয়াবহ লোমশ থাবা। লণ্ডভণ্ড করে দিবে আমার সাজানো সুন্দর জীবনটি। ব্যস্ আর দেরি নয়। দে-ছুট। উর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটাল যূনাওয়াস। যে করেই হোক প্রাণ নিয়ে পালাতেই হবে। আবেসিনিয়ার সৈন্যরা তার পশ্চাদ্ধাবন করল। তীর তীব্র গতিতে ঘোড়া ছুটান। বাতাসের গায়ে পা ফেলে ফেলে যেন তারা উড়ে চলছে। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারল না। ক্রমেই তাদের মাঝের দুরত্ব কমে আসতে লাগল।

নদী। খরস্রোত এক নদী বয়ে চলছে। বুক জুড়ে তার হাজারো উর্মিমালার তাণ্ডব। যূনাওয়াস ঘোড়া নিয়ে তার তীরে পৌছল। সে দিশেহারা। জ্ঞানশূন্য। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কী করবে? কোথায় যাবে? চিন্তারও সময় নেই। ঐ তো এগিয়ে আসছে আবেসিনিয়ীার সৈন্যরা। রক্তাক্ত তরবারী উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে। ইস কী নিষ্ঠুর ওরা! এখনই তো মেরে কুটিকুটি করবে। গোটা পৃথিবী তার নিকট অন্ধকার হয়ে এল। অমনি ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল খরস্রোতা নদীর বুকে। প্রমত্তা নদী উর্মিমালার অসংখ্য ফণা তুলে তাকে গ্রাস করে নিল। সলিল-সমাধি রচনা করে বাদশাহ যূনাওয়াস দুনিয়ার রঙ্গমহল থেকে চির বিদায় নিল।

বিশ্ব মানবতার কাছে আজ যূনাওয়াস একটি গলীজ নাম। একটি নাপাক শব্দ। একটি পাপিষ্ঠ নরাধম প্রেতাত্মা। কাল পরিক্রমায় প্রত্যেক প্রজন্মের লোকেরা তার নামে থু থু ফেলবে। গাল মন্দ করবে।

যূনাওয়াসের পর ইয়ামেন হল আবেসিনিয়ার করদ রাজ্য। অধীন রাজ্য। সেনাপতি আরবাত তার গর্ভনর। আরবাত খৃষ্টান হলেও চরিত্রে তার কোন বাড়াবাড়ি নেই। জোর জবরদস্তী করে কারো উপর ধর্ম চাপিয়ে দেয়ার মন মানসিকতা নেই। সবাইকে নিয়ে সুখে শান্তিতে সহাবস্থানই তার আদর্শ ও চিন্তাধারা। তাই ইহুদী-খৃষ্টান উভয় জাতি উষ্ণ সম্প্রীতির সাথে ইয়ামেনে বসবাস করতে লাগল। কোন গোলযোগ নেই। কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা নেই। কোন সাম্প্রদায়িক হানাহানিও নেই। শান্তির ফুরফুরে সমীরণে ইয়ামেনের অধিবাসীরা বিমোহিত। উল্লসিত।

আবরাহা। ইয়ামেন-আবেসিনিয়ার যুদ্ধে আরবাতের সহযাত্রী ও সহযোদ্ধা। ইয়ামেনের সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসার। অত্যন্ত দুর্ধর্ষ, দুর্জেয়।

মগজের টিস্যুতে টিস্যুতে কূট কৌশলের অবাধ বিচরণ। জীবনে তার আশা অনে-ক। আকাঙ্খা আকাশ ছাড়িয়ে। কিন্তু অধীনস্থ থেকে মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্নীল স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই যে করেই হোক ক্ষমতার শীর্ষে তাকে পৌছতেই হবে।

ষড়যন্ত্র! ষড়যন্ত্র!! ষড়যন্ত্র!!! গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হল গভর্নর ও সেনাপ্রধান আরবাতকে ঘিরে। গভর্নর প্রাসাদের বাইরে ষড়যন্ত্র। ভিতরে ষড়যন্ত্র। সেনাকুঞ্জের বাইরে ষড়যন্ত্র। ভিতরে ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্রের জালে গোটা ইয়ামেনকে গ্রাস করল। অনেক সেনা অফিসারকে লোভনীয় টোপ দেখিয়ে আবরাহা সহজেই শিকার করে নিল। তারপর সময় ও সুযোগ বুঝে আবরাহা তার সাথীদের নিয়ে বিদ্রোহ করল। দাবানলের ন্যায় সেনাবাহিনীতে সহিংসা ছড়িয়ে পড়ল। আরবাতও দমবার পাত্র নয়। সেও তার সমর্থকদের নিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে এগিয়ে এল। শুরু হল চারদিকে যুদ্ধ। ইয়ামেনের বায়ু তরঙ্গে আবার ছড়িয়ে পড়ল হাজারো আহত যোদ্ধার আর্তনাদ, হাজারো মৃতের করুণ গোঙানী। অবশেষে বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হল ইয়ামেনের শান্তি প্রিয় গভর্নর আরবাত। ক্ষমতার সিংহাসন দখল করল আবরাহা।

নাজ্জাসী আসবাহা। আবেসিনিয়ার প্রতাপশালী বাদশাহ। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের লালনে তার প্রভূত খ্যাতি। যা বলে তাই করে। তার অভিলাষে অন্ত রায় সৃষ্টি করার সাহস কারো নেই। তার স্বভাবে রয়েছে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। আকাশেও তুলতে পারে আবার মাটিতেও আছড়ে ফেলতে পারে। নাজ্জাসী আসবাহা ইয়ামেনের বিদ্রোহের সংবাদ শুনল। ক্রোধে ক্রোধে তার শরীর কাঁপতে লাগল। দাঁতে দাঁত পিষে কসম খেয়ে বলল, আমি নাজ্জাসী আসবাহা। আবরাহার রক্তে ইয়ামেনের মাটি রঞ্জিত করব। পদদলিত করব। তারপরই আমি শান্ত হব।

আবরাহা সব শুনল। ভয় আর আতঙ্ক গ্রাস করল তার অস্তিত্বকে। ভয়ে ভয়ে একেবারে এতটুকুন হয়ে গেল। এবার বাঁচার উপায় কি? চিন্তা! চিন্তা!! চিন্তা!!! চোখে ঘুম নেই। জিহ্বায় রুচি নেই। মনে শান্তি নেই। ক্ষণে ক্ষণে চিন্তা– জগতে কোথায় হারিয়ে যায় তার ঠায়-ঠিকানা নেই। চিন্তার ঘোড়ায় ছুটতে ছুটতে হঠাৎ এক অদ্ভুত সমাধান উদ্ভাসিত হল তার অন্তরে। আত্মবিশ্বাসে ভরে উঠল মন। মৃদু হাসির কিরণ মেখে তার অন্ধকার চেহারা

আলোকময় হয়ে উঠল। আত্মশ্লাঘায় স্ফীত হল তার বুক। হ্যাঁ, পেয়েছি। একটি চমৎকার সমাধান পেয়েছি। আর কোন চিন্তা নেই। আর কোন ভাবনা নেই।

আবরাহা নিজ দেহ ক্ষত করে কিছু রক্ত একটি শিশিতে ছিপিবদ্ধ করে নিল। আর একটি থলেতে কিছু মাটি ভরে নিল। রক্তের শিশিটি আর মাটির থলেটি এক চৌকান্না দূতের হাতে দিল। সাথে দিল একটি চিঠি। বলল, এক্ষুণি ঘোড়া নিয়ে ছুটবে আবেসিনিয়ায়। দ্রুত। অত্যন্ত দ্রুত যাবে। সোজা নাজ্জাসী আসহাবের নিকট পৌছে এগুলো অর্পণ করবে। চিঠিতে লিখল–

"মহামান্য বাদশাহ নাজ্জাসী আসবাহ-এর পদপ্রান্তে আমার সবিনয় নিবেদন, আরবাত যে রূপ আপনার আজ্ঞাধীন ছিল আমি গোলামও তেমনি আজ্ঞাধীন থাকব। শুনতে পেলাম, বাদশাহ মহোদয় আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই ভীষণ চিন্তা ও অস্থিরতায় সময় কাটাচ্ছি। আপনার কসম পূর্ণ করার জন্য আমি আমার দেহের কিছু রক্ত ও ইয়ামেনের কিছু মাটি পাঠালাম। আপনি রক্তকে মাটিতে ফেলে পদদলিত করে আপনার কসম পূর্ণ করে গোলামের প্রতি সদয় হোন এবং অধমকে ক্ষমা করে দিন।"

আবরাহার চিঠি খুলে নাজ্জাসী আসবাহা পড়তে লাগল। চিঠির একেকটি ছত্রের ছোঁয়ায় তার হৃদয়ের ক্রোধ বিগলিত হতে লাগল। বিগলিত হতে হতে সন্তুষ্টিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আবরাহা তার বুদ্ধিমত্তা ও কূট কৌশলের বলে এবারের মত বেঁচে গেল এবং ইয়ামেনের বৈধ গভর্নর নিযুক্ত হল।

আবরাহার চরিত্রে ছিল ভারসাম্যের দারুণ অভাব। আশৈশব সে গোঁড়া ধার্মিক। খৃষ্ট ধর্মের জন্য তার আহামরির শেষ নেই। এবার পেয়েছে সে অবারিত সুযোগ। সে এখন ইয়ামেনের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। মনের অভিলষিত স্বপ্নগুলো এবার একের পর এক বাস্তবায়ন করতে হবে।

অভিযান যাত্রা শুরু হল। গোটা ইয়ামেনে খৃষ্ট ধর্মের প্রচারক নিয়োগ করল। রাজ কোষাগার থেকে তাদের প্রচুর ভাতার ব্যবস্থা করল। বড় বড় শহরের কেন্দ্রস্থলগুলোতে মনমোহনী গির্জা নির্মাণ করতে লাগল। কয়েক

বৎসরে গোটা ইয়ামেন খৃষ্ট রাজ্যে পরিণত হল। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য ইয়ামেন সংকীর্ণ হয়ে এল। যত্রতত্র তারা প্রত্যাখ্যাত হতে লাগল।

ইতিমধ্যে আবরাহা সংবাদ পেল, আরবের মক্কায় এক ঘর আছে। নাম কা'বা। প্রতি বছর অগণিত মানুষ সেখানে ভিড় করে। আরবদের তা প্রাণপ্রিয় তীর্থস্থান। ইয়ামেন থেকেও বহু লোক সেখানে যায়। কেউ যায় পদব্রজে। কেউ যায় উট বা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে।

আবরাহার মাথা গরম হয়ে উঠল। কী এতো স্পর্ধা! আমার রাজ্যে থেকে মক্কার তীর্থস্থানে যাবে! না, তা হতে পারে না। কা'বা থেকে আরো সুন্দর শতগুণে চমৎকার তীর্থস্থান আমি ইয়ামেনে তৈরী করব। রাজধানী সান'আয় তা তৈরী করব। তারপর দেখব, কার সাহস আছে? কে যায় মক্কায়?

সাথে সাথে ডেকে আনল উজির নাজির আর গণ্যমান্য লোকদের। বলল, আমার ইচ্ছা, রাজধানী সান'আয় একটি গির্জা তৈরী করব। যা হবে নির্মাণ শিল্পে অদ্বিতীয়। অতুলনীয়। ইতিহাসের পাতায় যার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। উজিরকে বলল, যখন যা প্রয়োজন রাজ কোষাগার থেকে তার ব্যবস্থা কর। দ্রুত নির্মাণ শেষ করতে হবে।

শুরু হল নির্মাণ কাজ। পৃথিবীর অদ্বিতীয় গির্জার নির্মাণ কাজ শুরু হল। নাম রাখা হল আল-কালিস। ইয়ামেনের জনগণকে বিনা পারিশ্রমিকে নির্মাণের কাজে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হল। হাজার হাজার শ্রমিক অনবরত কাজ করে চলল। রাজ কোষাগারের ধন-সম্পদ, হীরা-জহরত অকাতরে এ নির্মাণ কাজে ব্যয় হতে লাগল। তর তর করে সুদীর্ঘ সুপ্রশস্ত, বিস্ময়কর ও মোহময় আল-কালিস তৈরী হল। জায়গায় জায়গায় মহামূল্যবান পাথর স্থাপিত। বিস্ময়কর স্বর্ণ খচিত চিত্রাবলীতে চিত্রিত। উজ্জ্বল ঝলমলে রত্নখণ্ডে সজ্জিত। রৌপ্য নির্মিত ক্রশ চিহ্নসমূহে সুশোভিত। আল-কালিস দেখে দর্শক মাত্র বিস্মিত বিমোহিত আর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

আবরাহার মনে আনন্দের ঢেউ। আকুল আগ্রহ নিয়ে মানুষের প্রশংসা-বাণী শুনে। গর্বে বুক স্ফীত হয়। ভাবালু মন তার অস্থির হয়ে উঠে। হ্যাঁ, এবার

আর ইয়ামেনের কেউ মক্কায় যাবে না। ক্বা'বার পরিবর্তে তীর্থকেন্দ্র হবে এই মন মাতানো আল-কালিস। তাছাড়া আল-কালিসের তীর্থ-যাত্রীদের জন্য আমি উন্নতমানের সুস্বাদু খাবার আর দুগ্ধ ফেননিভ বিছানারও আয়োজন করব। ভাত ছিটালে কাকের অভাব হয় না। ক্বা'বাকে ফেলে আরবের লোকেরাও ছুটে আসবে এই আল-কালিসে। ভাবতে ভাবতে আকুল হয়ে যায় আবরাহা। আনন্দে টুনটুনির মত চঞ্চল হয়ে উঠে তার মন।

পরদিন ইয়ামেনের পথে-প্রান্তে, নগরে-বন্দরে রাজ ঘোষকের কণ্ঠে বিঘোষিত হল, 'আজ থেকে রাজধানী সান'আর আল-কালিস হবে ইয়ামেনীদের একমাত্র তীর্থস্থান। ইয়ামেন থেকে কেউ আর ক্বা'বায় যেতে পারবে না। আল-কালিস হবে সকলের ক্বা'বা। আল-কালিসের তীর্থ যাত্রীদের জন্য বিশেষ আপ্যায়ন ও থাকার ব্যবস্থা থাকবে। রাজাজ্ঞা উপেক্ষা করে কেউ ক্বা'বায় গেলে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।'

গোটা ইয়ামেনে আবরাহার এই ঘোষণা বিঘোষিত হল। পথিক চলার গতি থামিয়ে ঘোষণা শুনল। তারপর নিজ পথে চলে গেল। শ্রমজীবী মানুষ উৎকর্ণ হয়ে শুনল আবার নিজ কাজে হারিয়ে গেল। গোঁড়া খৃষ্টানরা বিমুগ্ধ হল। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বিমর্ষ হলেও নির্বিকার রইল। রাজ-ঘোষণার বিপক্ষে টু শব্দটি করার কেউ সাহস পেল না।

কিন্তু আল-কালিসের বিরাট বিস্তৃত চত্বর লোকে লোকারণ্য হল না। চারদিক ফাঁকা। খাঁ খাঁ করে। কিছু গোঁড়া খৃষ্টান মাঝে মাঝে সেখানে যাতায়াত করে। আবরাহার এতো আয়োজন, এতো কষ্ট-মুজাহাদা, এতো ধনরত্ন সবই যেন ভেস্তে গেল। মানুষের মাঝে তা কোন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারল না। কেউ আল-কালিসের প্রতি আকৃষ্ট হল না।

কিন্তু গোপনে গোপনে অনেকেই ক্বা'বায় যায়। বায়তুল্লাহ তওয়াফ করে। কিছু দিন সেখানে কাটায়। আবার প্রশান্ত চিত্তে ফিরে আসে। ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ. এর স্মৃতি বিজড়িত এই পুণ্যভূমি ও ঘরকে তারা ভুলতে পারে না। চুম্বকের ন্যায় এক রহস্যময় আকর্ষণ শক্তি তাদের মনকে সারাক্ষণ আকর্ষণ করে অস্থির উতলা করে তোলে। তাই ক্বা'বাকে তারা ভুলতে পারে না। ক্বা'বাকে তারা ছাড়তে পারে না।

আবরাহা সব কিছু শুনতে পায়। সারা গায়ে তার আগুন ধরে যায়। একটা রক্তাক্ত আক্ষেপ সারাক্ষণ তার হৃদয়ে মাথা কুটতে থাকে। একটা মানসিক বেদনা তার সমস্ত সত্তাকে মথিত করতে থাকে। অহঙ্কারের ফানুসটা ক্রমে ফুলতে থাকে। ভাবে, ক্বা'বা থাকতে কি আল-কালিসে কেউ আসবে না? তাহলে আমার সকল প্রচেষ্টা কি ব্যর্থ হবে? খৃষ্ট ধর্মের ইজ্জত বুঝি ধূলি লুণ্ঠিত হবে। না, কিছুতেই তা হতে পারে না। তারপরই সে প্রতিজ্ঞা করল। নিটোল নিষ্কম্প প্রতিজ্ঞা। তাহলে ক্বা'বাকেই ধ্বংস করতে হবে। দুনিয়ার বুক থেকে তার অস্তিত্ব মিটিয়ে দিতে হবে। তাহলেই সকল ল্যাঠা চিরতরে চুকে যাবে। সব ঝামেলার অবসান ঘটবে। আবরাহা মনে মনে ক্বা'বা ধ্বংসের অজুহাত খুঁজতে লাগল।

সকালের মিষ্টি রোদে মাখামাখি হয়ে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আল-কালিস। অলিন্দে অলিন্দে লুটিয়ে পড়েছে সূর্যের কোমল কিরণ। আল-কালিসের মহা পাদ্রী অলিন্দ থেকে অলিন্দে পায়চারী করছে। ঘুরে ফিরে দেখছে। এক অলিন্দে এসে হঠাৎ বিস্ময়ে থ বনে গেল। চিৎকার শুরু করল। এই কে কোথায় আছিস, ছুটে আয়! জলদি আয়! কোন নরাধম এ কাজ করল? কে এই সর্বনাশ করল? কে এই পবিত্র গির্জাকে অপবিত্র করল?

পাদ্রীর চিৎকারে ছুটে এল অনেকে। সবার চোখ ছানাবড়া। অ্যাঁ, কোন শয়তান এ কাণ্ড করল? কে পায়খানা করে আল-কালিসকে অপবিত্র করল? কার এতো সাহস! এতো স্পর্ধা! এ নিয়ে জল্পনা কল্পনা শুরু হল। শত মুখের শত মত। কেউ বলল, নিশ্চয় এটা কোন দুরাচার আরবের কাণ্ড। আল-কালিসকে অপবিত্র করার জন্যই তা করেছে।

আরেকজন বলল, আরে না না। আমাদের দেশেরই কেউ এ কাজ করেছে। তার মতলব, ক্বা'বার বিরুদ্ধে লোকদের ক্ষেপিয়ে তোলা।

আবরাহা এ সংবাদ শুনেই একেবারে অগ্নিশর্মা। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, যে যাই বলুক, আসলে এটা আরবদের কাজ। আল কালিসকে তারা সহ্য করতে পারছে না। ঠিক আছে, এবার আমিও দেখে নিব। গজগজ করতে করতে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল। উজির নাজির সেনাপতি আর সভাদদের ডেকে বলল, এটা মক্কায় কুরাইশদের শয়তানী। অনেক সয়েছি, আর নয়। এবার যুদ্ধ চাই। সবাইকে তৈরী হতে নির্দেশ দাও। ক্বা'বাকে

ধ্বংস করে তবেই আমি শান্ত হব। নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারব।

ইয়ামেনের এক বিশাল প্রান্তরে আবরাহার বাহিনী সমেবেত হল। ষাট হাজার সশস্ত্র সৈন্য। সারির পর সারি। বহু সারিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে সৈন্য। সবার আগে তেরটি ইয়া বড় বড় হাতি। দেখলেই শরীর শিউড়ে উঠে। হৃদয়ে কাঁপন ধরে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হাতিতে সওয়ার হল আবরাহা। ক্বা'বাকে ভেঙ্গে চুরে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে মার্চ করতে এগিয়ে চলল এ বিশাল বাহিনী। ইয়ামেনের গোড়া খৃষ্টানরা হাত তালি দিয়ে এই অভিযানকে স্বাগত জানাল। ভাবল, আবরাহার এই যথোচিত সিদ্ধান্তের ফলে আরবের বুদ্দুদের গর্ব চিরতরে শেষ হয়ে যাবে। ক্বা'বার পরিবর্তে আল-কালিসই হবে আরব উপদ্বীপের সেরা তীর্থস্থান।

ইয়ামেনের সীমানা অতিক্রম করে মরুর পথ ধরে এগিয়ে চলল আবরাহার বাহিনী। সবার আগে আগে যাচ্ছে আবরাহার হাতি। হেলে দুলে বীর দর্পে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাতাসের গতির আগে আগে আবরাহার এ অভিযানের সংবাদ আরবের কবিলায় কবিলায় ছড়িয়ে পড়ল। সবাই হায় হায় করে উঠল। কিন্তু কে এগিয়ে আসবে এ বিশাল বাহিনীর সম্মুখে। আরবদের মাঝে কোন ঐক্য নেই। কবিলায় কবিলায় তারা বিভক্ত। প্রত্যেক কবিলার এককে জন সর্দার। সর্দারদের মাঝে কোন মিল নেই। কোন সম্প্রীতি নেই। তাই একক নেতৃত্বে তারা একত্রিত হতে পারল না। আবরাহা অনেক দূর চলে এল।

যুনাফার। অত্যন্ত দুঃসাহসী সর্দার। মরুর বুকে তার গোত্রের আবাস। প্রকৃতির প্রতিকূলে জীবন সংগ্রামে জয়ী থাকা তাদের অভ্যাস। যুনাফার শুনতে পেল, ইয়ামেনের বাদশাহ আবরাহা বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে। তার কবিলার পাশ দিয়ে মক্কায় যাবে। আল্লাহর ঘর ক্বা'বা ধ্বংস করা তার ইচ্ছা। তার অভিলাষ।

বীর যুনাফার শরীরে আগুন ধরে গেল। গর্জে উঠল। অসহ্য! অসহ্য!! এতো বড় সাহস! আমার কবিলার পাশ দিয়ে নির্বিঘ্নে গিয়ে আল্লাহর ঘর ক্বা'বা ধ্বংস করবে। এ মস্ত বড় অপমান। কিছুতেই আমি তা সইতে পারব

না। ভাগ্যে যা আছে তা হবে। তবে একটু ভাগ্যপরীক্ষা করা দরকার।

সাজ সাজ রব পড়ে গেল যুনাফার গোত্রে। ঢাল তলোয়ার আর বর্শা নিয়ে সবাই প্রস্তুত। সুবিধামত জায়গায় ওঁৎ পেতে রইল। আবরাহার বাহিনী যেই না এগিয়ে এল অমনি যুনাফার অনুগত যোদ্ধারা আক্রমণ শুরু করল। ভীষণ আক্রমণ। কিন্তু হাতে গোনা মানুষগুলো কিভাবে আবরাহার বিশাল বাহিনীকে রুখতে পারে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পিছু হটতে বাধ্য হল। বিজয়ী হল আবরাহার বাহিনী। অহঙ্কারের তার শেষ নেই। গর্বের তার অন্ত নেই। মরুর ধুলি উড়িয়ে তার বাহিনী আবার এগিয়ে চলল। নানা বাধা অতিক্রম করে বহু চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে এগিয়ে চলল। দুর্বার তার পদক্ষেপ। দুর্দম তার গতি। চলছে তো চলছে।

খাছআম গোত্র। অত্যন্ত যুদ্ধবাজ এ গোত্রের লোকেরা। হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করা তাদের অহঙ্কার। নুফাইল এ গোত্রের সর্দার। অত্যন্ত প্রভাব ও প্রতাবশালী সর্দার। সেও শুনল আবরাহার কুমতলবের কথা। ক্রোধে ক্ষোভে শরীর তার রি রি করে উঠল। চিৎকার করে উঠল, আঁ্যা, আবরাহার এতো বড় স্পর্ধা! জীবন দিব তবু তাকে মক্কায় যেতে দিব না। সাথে সাথে গোত্রের যোদ্ধাদের নিয়ে রুখে দাঁড়াল। শুরু হল যুদ্ধ। ভীষণ যুদ্ধ। কিন্তু অল্প কয়েকজন যোদ্ধাকে নিয়ে নুফাইল সুবিধা করতে পারল না। বন্দী হল।

সকল বাধা অতিক্রম করে আবরাহা তার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে চলল। চলতে চলতে তায়েফের প্রান্তরে এসে পৌছল। তায়েফের অধিবাসীরা সব শুনল। দুরু দুরু কেঁপে উঠল তাদের অন্তর। অজানা অশঙ্কায় তারা ভীত সন্ত্রস্ত। চারদিকে ত্রাহি ত্রাহি ভাব ছড়িয়ে পড়ল। জরুরী বৈঠকে নেতৃস্থানীয় সবাই ছুটে এল। এ মুহূর্তে কী করনীয় তাই নিয়ে আলোচনা। অনেকে বলল, আবরাহার এই বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব নয়। তাই গা ঢাকা দিয়ে থাকাই ভাল।

কয়েকজন প্রতিবাদের সুরে বলল, না, না, তা হয় না। পালিয়ে না হয় জান বাঁচালাম। কিন্তু গোটা জীবনের তিলে তিলে সঞ্চিত সম্পদগুলোর কথা কি ভেবে দেখেছ? সবই তো তার বাহিনী লুট করে নিয়ে যাবে।

কয়েকজন সম্মতি প্রকাশ করে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাও ভাবতে হবে। জানও বাঁচাতে হবে মালও রক্ষা করতে হবে।

শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত এক ব্যক্তি দাঁড়াল। প্রতিভার দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে তার চোখ-মুখ আর ওষ্ঠাধর থেকে। বলল, এক কাজ করা হোক। আমরা একজন চতুর চৌকান্না ব্যক্তিকে কিছু উপহার সামগ্রীসহ আবরাহার নিকট পাঠাই। আমার মনে হয়, তদবীর করলে একটা সমাধান অবশ্যই বের হয়ে আসবে।

উপস্থিত সবার মাথা দুলে উঠল। বলল, উত্তম প্রস্তাব, উত্তম পরামর্শ। কিন্তু কে প্রতিনিধি হবে? কে সেই চালাক চতুর চৌকান্না ব্যক্তি? বায়ু তরঙ্গে প্রশ্নবোধক চিহ্নটি ক্রমশ বড় হতে হতে নিঃশেষ হয়ে গেল। তারপরই সবার দৃষ্টি লুটিয়ে পড়ল মাসউদ ইবনে মুয়াত্তাবের উপর। বনু সাকীফ গোত্রের এই সর্দার দারুণ বুদ্ধিমান। সর্বদা সজাগ সর্তক। কথার মারপ্যাঁচে মারাত্মক দুরন্ধর। সবাই মিলে তাকেই প্রতিনিধি নিযুক্ত করল।

মাসউদ উপঢৌকনসহ আরবাহার সাথে সাক্ষাৎ করল। রসদ পত্র আর খাদ্যের কোন সংকট নেই। অস্ত্র শস্ত্রের কোন কমতি নেই। তাই বলল, তোমরা আমাকে আর কী সাহায্য করবে। তবে একজন পথ প্রদর্শক দিলে আমরা সহজেই মক্কায় গিয়ে পৌছতে পারতাম।

আবরাহার মহানুভবতায় তায়েফের লোকেরা দারুণ খুশি। সাথে সাথে আবু রিগালকে নিয়ে এল। আবু রিগাল হল পথ প্রর্দশক। আবরাহার বাহিনীকে নিয়ে মক্কার পথে এগিয়ে চলল। হতভাগ্য আবু রিগাল। মক্কায় পৌছ তার ভাগ্যে জুটল না। মাঝ পথেই অক্কা পেল। সেখানেই তাকে পুঁতে আবরাহার বাহিনী এগিয়ে চলল।

আবরাহার বাহিনী আরো এগিয়ে এল। আরাফাত প্রান্তরে এসে উপস্থিত হল। আর কিছুটা এগুলেই ক্বা'বা গৃহ। জানের দুশমন, প্রাণের দুশমন এই ক্বা'বাগৃহ। কিছুক্ষণ পরই তাকে ভেঙ্গে গুড়িয়ে ফেলবে। তাই মনটা তার দারুণ আনন্দিত। অত্যন্ত উৎফল্ল। হৃদয়াকাশে খুশির পায়রাগুলো বার বার ডিগবাজি খাচ্ছে।

এদিকে সেনাছাউনী ছেড়ে সৈন্যরা বেড়িয়ে পড়ল। ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল মরু প্রান্তরের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। দেখতে পেল, খোলা মাঠে

অনেকগুলো উট চরছে। হৃষ্টপুষ্ট। দারুণ চমৎকার। জিহ্বায় লালা এসে গেল। ব্যস্ ধরে আনল উটগুলো। পাক করে ভুড়ি ভোজন করলে দারুণ হবে। টানতে টানতে উটগুলো সেনা ছাউনিতে নিয়ে এল।

ইতিমধ্যে মক্কায় সংবাদ পৌছে গেছে। হায় হায় রব উঠেছে চারদিকে। সবাই উদ্ভ্রান্ত। সবাই দিশেহারা। সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিছুই করার নেই। আবরাহার এ বিশাল বাহিনীর সামনে প্রতিরোধ গড়ে তোলা অসম্ভব। তবুও কিছু একটা করতে হবে। আব্দুল মুত্তালিব মক্কার সর্দার। সবাই ছুটে এল তার নিকট। বনু মাখযূমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা এল। হুযাইলের নেতৃস্থানীয় লোকেরা এল। ছুটে এল আরো অনেকে। জরুরী পরামর্শ সভা বসল। তর্ক বিতর্ক হল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল, আবরাহার এই বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে মুকাবিলা অসম্ভব। আত্মহত্যার শামিল। তাই আবরাহার বাহিনী এগিয়ে আসার পূর্বে মক্কা খালি করে নিকটবর্তী পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে আমাদের আশ্রয় নিতে হবে।

পরামর্শ সভা যখন চলছে ঠিক তখন আবরাহার এক দূত এল। মক্কার সর্দারকে খুঁজছে। লোকেরা তাকে আব্দুল মুত্তালিবের নিকট নিয়ে এল। অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সে বলল, আমি বাদশাহ আবারাহার দূত। একথা জানাতে এসেছি যে, আমরা আপনাদের জান মালের কোন ক্ষতি করব না। আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও আমরা আসি নি। আমরা ক্বা'বা ঘর ভেঙ্গে চলে যাব। অতএব যদি মুকাবিলা করতে চান, তাহলে ভেবে চিন্তে দেখুন। আর যদি তা না করেন তাহলে বাদশাহ আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান।

আব্দুল মুত্তালিব আবরাহার তাবুতে পৌছল। কথা শুরু হল। কিন্তু তার কণ্ঠ নিরুত্তাপ। একেবারে শান্ত। বলল, আমরা যুদ্ধ করব না। প্রতিরোধও করব না। যুদ্ধ বা প্রতিরোধ করার সাধ্য ও সামর্থও আমাদের নেই। এটা বাইতুল্লাহ। আল্লাহর ঘর। আল্লাহই তা হিফাজত করবেন।

আব্দুল মুত্তালিব যেমন সুশ্রী সুন্দর তেমনি ভাবগম্ভীর। তদুপরী দক্ষ কথাকার। সাবলীল ও অচঞ্চল তার কথার মালা। আব্দুল মুত্তালিবের প্রাঞ্জল ভাষা ও বাগ্মিতায় আবরাহা অভিভূত হল। তারপরই আব্দুল মুত্তালিব বলল, আপনার সৈন্যরা আমার দু'শত উট ধরে নিয়ে এসেছে। তাই সর্বাগ্রে আমার আবেদন, আমার উটগুলো ফিরিয়ে দেয়া হোক।

আবরাহা হতবুদ্ধি। বিস্ময়াহত। বলল, আমি তোমাকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মনে করেছিলাম। কিন্তু তোমার এ কথায় আমার ধারণা একেবারে পাল্টে গেছে। আমি বিশাল বাহিনী নিয়ে তোমাদের তীর্থগৃহকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে এলাম। অথচ তুমি সে সম্পর্কে কিছুই বললে না। তুমি এখানো তোমার উটের চিন্তায় বিভোর।

আব্দুল মুত্তালিবের কণ্ঠ আরো শান্ত। আরো সুসমাহিত। বললেন, বাদশাহ নামদার! উটগুলোর মালিক আমি। তাই আমি তার হিফাজতের চিন্তা করছি। কিন্তু বাইতুল্লাহ তো আমার ঘর নয়। আল্লাহর ঘর। আমি তার মালিকও নই। তাই তা নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই। কোন ভাবনা নেই। যার ঘর তিনিই তা হেফাজতের চিন্তা করবেন। একরাশ দম্ভ আর অহঙ্কার ঝরে পড়ল আবরাহার কণ্ঠ চিরে। বলল, শোন হে মক্কার সর্দার! এখন আর কেউ আমার হাত থেকে ক্বা'বাকে রক্ষা করতে পারবে না। আমি তা ভেঙ্গে চুরে ধূলিস্মাৎ করে তবেই ফিরে যাব।

আবদুল মুত্তালিব আরো শান্ত ও নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, তা আপনি জানেন আর জানেন ঐ ঘরের মালিক। আমি তাতে নাক গলাতে চাই না। আবরাহার নির্দেশে আব্দুল মুত্তালিবের দু'শত উট আব্দুল মুত্তালিবকে ফিরিয়ে দেয়া হল।

উটগুলো নিয়ে আব্দুল মুত্তালিব মক্কায় ফিরে এল। ছুটে এল মক্কার লোকেরা। ঘিরে ধরল তাকে চারদিক থেকে। উদগ্র আগ্রহ তাদের চোখে মুখে। দারুণ অনুসন্ধিৎসা তাদের নয়নে নয়নে। আব্দুল মুত্তালিব বলল, এখন আর আমাদের মক্কায় থাক ঠিক নয়। সবাই নিকটবর্তী পাহাড়ের কোলে আশ্রয় নাও।

মক্কায় হুলস্থূল পড়ে গেল। চারদিকে চাঞ্চল্য ছুটাছুটি। অতি প্রয়োজনীয় সমান পত্র নিয়ে ঘর বাড়ি ফেলে সবাই ছুটে চলছে পাহাড়ের নিরাপদ কোলে। ছোট্ট নগরী মক্কা। দেখতে দেখতে জনশূন্য হয়ে গেল। যাওয়ার প্রাক্কালে অনেকেই ক্বা'বা চত্বরে এসে দাঁড়িয়েছে। অশ্রু বিজাড়িত নিস্পলক নয়নে কিছুক্ষণ ক্বা'বার দিকে তাকিয়ে থেকে মনের আকুতি আল্লাহর নিকট বলেছে। তারপর অশ্রু মুছতে মুছতে চলে গেছে। দুঃখ-বেদনা, আর অনন্ত ক্ষোভে অবাধ্য মন হিংস্র হয়ে উঠতে চাইলেও কিছুই তাদের করার নেই। দু'আ আর অশ্রু বিসর্জনই অক্ষমের শেষ আশ্রয়।

মক্কার পথঘাট খাঁ খাঁ করছে। সবাই চলে গেছে পাহাড়ের কোলে। এবার আব্দুল মুত্তালিব তার কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে রওয়ানা হল। প্রথমে এল ক্বা'বা-চত্বরে। আরো এগিয়ে এল। আরো এগিয়ে এল। বাইতুল্লাহর দরজার শিকল ধরে আবেগে আপ্লুত হয়ে কাঁদল। রোরুদ্য বিনয় বিগলিত কণ্ঠে আবৃতি করল–

لاهم إن العبديم   نع رحله فامنع رحالك

لا يغلبن صليبهم   ومحالهم غدوا محالك

إن كنت تاركهم وقب لتنا فامر مابدا لك

কোন দুশ্চিন্তা নেই। নিশ্চয় মানুষ তার সম্পদকে হিফাজত করে। রক্ষা করে। সুতরাং (হে আল্লাহ) আপনিও আপনার সম্পদ অর্থাৎ ক্বা'বাকে হিফাজত করুন।

আপনার রক্ষা ব্যবস্থার উপর কিছুতেই ক্রুশ জয়ী হতে পারবে না। আপনার গৃহের সীমানায় পৌছাও তাদের জন্য সম্ভব হবে না।

তবে আপনি যদি নিজেই তাদেরকে আমাদের ক্বিবলাকে ধ্বংস করতে দেন, তাহলে তো আমাদের কিছুই করার নেই। আপনার মনে যা চায় আপনি তাই করুন।

আব্দুল মুত্তালিব অশ্রু ফেলতে ফেলতে পাহাড়ের দিকে হাটতে লাগল। পথ-ঘাট, বাড়ি-ঘর খাঁ খাঁ করছে। জনমানবের কোন কলরব নেই। এক নিঝুমপুরীর পথ ধরে যেন আব্দুল মুত্তালিব হেঁটে চলছে। পেছনে পড়ে রইল হাড়ভাঙ্গা কষ্টের সাজানো গোছানো বাড়ি-ঘর। তিল তিল করে পুঞ্জিভূত করা ধন-সম্পদ।

পরদিন সকালের সূর্য পৃথিবীকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিল। আকাশ বেশ পরিস্কার। মেঘের আনাগোনা নেই। নির্মল আলো আর বায়ুতে আবরাহার মনে আনন্দের দোলা লাগল। তার নিদের্শে বিশাল বাহিনী এগিয়ে চলল। সবার সামনে বিশালকায় হাতির উপর সমাসীন আবরাহ। নতুন সাজে আজ সে সজ্জিত। মনে তার আনন্দের দোলা। এতো কষ্টের পর আজ তার সাধনা সফল হবে।

ক্বা'বাকে ধূলিস্মাৎ করে ভেঙ্গে-চুরে গুঁড়িয়ে ফিরে যাবে ইয়ামেনে। আল-কালিসের হবে জয়। আরবের বুকে একটিই হবে তীর্থস্থান। তা হল আল-কালিস। সুখের ভাবনায় তন্ময় হয়ে যায় আবরাহা।

মরুর ধূলি উড়িয়ে আবরাহার বিশাল বাহিনী মক্কার পথে এগিয়ে আসছে। এইতো আর খানিকটা এগুলেই মক্কায় পৌঁছে যাবে। তারপরই ক্বা'বা। চলতে চলতে হঠাৎ আবরহার হাতি ধপাস করে মাটিতে বসে পড়ল। চমকে উঠল আবরাহা। আরে, হাতির আবার হল কী! পায়ে কোন আঘাত পায়নি তো? বালিতে কি পা দেবে গেছে? না না কিছুই হয়নি। তাহলে হাতি উঠে দাঁড়ায় না কেন? অনেক চেষ্টা চলল। অনেক তদবীর চলল। কিন্তু হাতি উঠল না। পিঠ চাপড়াল, চাবুক মারল। কিন্তু হাতি নির্বিকার। স্তব্ধ। এতক্ষণে একজন বিজ্ঞ মাহুত এগিয়ে এল। মাথায় কপালে হাত বুলাল। একটু ধাক্কা দিয়ে ডান দিকে টান দিতেই হাতি উঠে ডান দিকে ছুটতে লাগল। সবার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

আবরাহাও মুখ টিপে হাসল। কিন্তু হাতিটিকে আবার কাবামুখী করতেই ধপাস করে বসে পড়ল। কিছুতেই উঠতে চায় না। বোবা হাতিটি শুধু ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। কি যেন বলতে চায়। কিন্তু সে তো মূক। কিছুই বলতে পারে না।

আবার এগিয়ে এল ঐ মাহুত। হাতির মাথায় হাত বুলাল। কপালে হাত বুলাল। তারপর একটু ধাক্কা দিয়ে বাম দিকে টান দিতেই হাতি উঠে ছুটতে লাগল। আবার ধরে কাবামুখী করতেই ধপাস করে বসে পড়ল।

ডানে যায়। বামে যায়। পশ্চাতে যায়। কিন্তু কাবার দিকে যায় না। মহা মুশকিল! কী ব্যাপার! আবরাহার মন অস্থির হয়ে উঠল। অজানা ভয় আর আতঙ্ক যেন ফণা তুলে তার দিকে এগিয়ে আসছে। শিউরে উঠল তার সারা শরীর। বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরতে লাগল তার কপাল বেয়ে।

সবাই ব্যস্ত। হাতিকে নিয়েই সবার ব্যস্ততা। ঠিক তখন পশ্চিম দিক থেকে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত শুরু হল। তারপরই লোহিত সাগরের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এক অভিনব পাখি উড়ে আসতে লাগল। আরবরা এ ধরনের পাখি আর কখনও দেখেনি। প্রত্যেকটি পাখির চঞ্চুতে ও দুই পাঞ্জায় ছোট ছোট পাথর। পাখিগুলো উড়ে এসে আবরাহার বাহিনীর উপর ছেয়ে গেল।

তারপরই প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করল। বুটের আকারের প্রস্তরখণ্ডগুলো বুলেটের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর রূপে তাদের উপর পড়তে লাগল। শরীরে পড়েই শরীর ভেদ করে বের হয়ে যায়। মুহূর্তে শরীর পচে গলে খসে খসে গোশত পড়তে থাকে।

গোটা বাহিনীতে শোরগোল শুরু হয়ে গেল। চিৎকার আর আর্ত রবে আকাশ বাতাস কাঁপতে লাগল। পাখিরা উড়ে উড়ে লক্ষ্য নির্ধারিত করে পাথর ছুঁড়তে লাগল। মহাপ্রলয়ের তাণ্ডবে যেন আবরাহার বিরাট বাহিনী লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। বিশাল প্রান্তর জুড়ে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রইল লাশের পর লাশ। পচন ধরা শরীর গলতে গলতে শুধুমাত্র কঙ্কালগুলোর অস্তিত্বই বাকি রইল।

আবরাহা পালাল। কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ইয়ামেনের দিকে ছুটল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য আবরাহা। ভয়ার্ত তার হৃদয়। কিন্তু পক্ষী বাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে পারল না। তাকে লক্ষ্য করেই যেন উড়ে গেল কিছু পাখি। প্রস্তরাঘাতে আহত হল আবরাহা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পচে গলে পড়তে লাগল রাস্তায় রাস্তায়। শুধু প্রাণটুকু নিয়ে যখন আবরাহা ইয়ামেনে পৌঁছল, তখন সে একখণ্ড পচা গলা মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই রইল না।

ধিক্ জড়বাদী শক্তির। ধিক্ অহংকার আর গর্বের। ধিক্ শয়তানী শক্তির। সময়ের স্রোতের বাঁকে বাঁকে যারা খোদায়ী শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছে তাদের পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। লোমহর্ষক। বেদনাবিধুর। ধরার বুক থেকে তারা চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ইতিহাস এ শিক্ষাই আমাদের সামনে বারবার তুলে ধরে। এ উপদেশই আমাদের সামনে বারবার উপস্থাপিত করে। কিন্তু আমরা কি ইতিহাস থেকে উপদেশ গ্রহণ করি? উপদেশ থেকে শিক্ষা লাভ করি? কাল পরিক্রমায় আমরা সবই ভুলে যাই।

খোদ মক্কার লোকেরাই কি এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল? হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে আবির্ভূত হয়ে ঈমানের দাওয়াত দিলে কি তারা নির্বিবাদে কবুল করেছিল? না, করেনি। মাত্র চল্লিশ বা বিয়াল্লিশ বছরের ব্যবধানে তারা সব ভুলে গিয়েছিল। জড়বাদী শক্তির গর্বে গর্বিত ও উন্মাদ হয়ে আবার তারা আল্লাহর শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছিল।

তাই আল্লাহ অবতীর্ণ করেছিলেন সূরা ফীল। সুতরাং ত্রিশতম পারার এ সূরাটি চিরকাল দর্পী, অহংকারী, খোদাদ্রোহী ও শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। বিনম্র, বিনয়ী, অনুগত ও আল্লাহ্‌ওয়ালাদের অন্তরে হিদায়াতের কিরণ ছড়াবে।

হে আল্লাহ! আঁমাদের সেই হিদায়াতের কিরণ দান কর। সর্বদা দীনের পথে চলার তাওফিক দান কর। পবিত্র কুরআনকে আলোকবির্তকারূপে গ্রহণ করার তাওফিক দান কর। আমীন! ছুম্মা আমীন!

স মা প্ত